

মাওলানা সা'দ সাহেবের ভ্রান্তি ও তার জবাব

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد!

তাবলীগ জামাতের পরিচিতি

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উলামায়ে কেরামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত দাওয়াত ও তাবলীগ।

প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ ভারত উপমহাদেশের হকপন্থী, প্রজ্ঞাময়, উম্মাহর আস্থাভাজন, আল্লাহতীকর, বিজ্ঞ আলেমদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন দারুল উলুম দেওবন্দের কৃতিসন্তান যুগশ্রেষ্ঠ ওলী হযরত মাওঃ ইলিয়াস রহ.। বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগ পৃথিবীর বৃহৎ ইসলামী দাওয়াতী কর্মপন্থা। এই মহান দাওয়াতী কাফেলার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান ছায়াতলে বিশ্বের মানুষগুলোকে আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান এবং মানবজাতির আকীদা, আমল, আখলাকের আমূল পরিবর্তন ও সংশোধন।

মাওঃ ইলিয়াস সাহেব রহ. এর বাণী: “আমি দেখতে পাচ্ছি সাধারণ লোকজন ব্যাপকভাবে আলেমদের থেকে দূরে সরে গেছে। যার ফলে তাদের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও দ্বীনবিমুখতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান একটাই, তা হলো তাদেরকে উলামামুখী করে তোলা। কিন্তু তাদের অন্তরে যে পিপাসা নেই। তাই সাধারণ লোকদের অন্তরে জ্ঞানের পিপাসা জন্মানোর উদ্দেশ্যেই মূলত আমি এ তাবলীগের মেহনত শুরু করেছি।” (বয়ান: আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী)

যুগের বিজ্ঞ ওলামা ও মাশায়েখদের দিক-নির্দেশনা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যেহেতু এই মহতি খালেস দ্বীন জামাতটির সূচনা। তাই এই জামাতের সাফল্য আকাশচুম্বী। হযরত মাওঃ ইলিয়াস রহ. তাবলীগের এই মোবারক কাজটি যাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধান এবং দুআ ও নেকদৃষ্টিতে পরিচালনা করতেন তাদের অগ্রভাগে ছিলেন: হযরত মুফতী কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী রহ., হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ., শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া রহ., হাকিমুল ইসলাম মাওঃ কারী তৈয়্যব রহ., শাইখুল আদব মাওঃ ইজাজ আলী রহ., হযরত মাওঃ শাহ আব্দুল কাদির রায়পুরী রহ.সহ অসংখ্য উলামায়ে দেওবন্দ। হযরত ইলিয়াস সাহেব রহ. এসব বিজ্ঞ মনিষীদের পরামর্শেই তাবলীগ জামাতের কাজের নকশা তৈরি করেছিলেন। তিনি এসকল বুয়ুর্গানে দ্বীনের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতাকে একান্ত জরুরী বলে মনে করতেন।

মাওঃ ইলিয়াস সাহেব রহ. এর দ্বিতীয় বাণী: এ ব্যাপারে তিনি বলতেন “এই সিলসিলায় একটি উসূল এই যে, স্বাধীনভাবে এবং নিজের মতামতের উপর চলা যাবে না; বরং নিজেকে ঐ সমস্ত বুয়ুর্গানে দ্বীনের পরামর্শের উপর পরিচালনা করতে হবে যাদের উপর ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী আকাবির হযরাতগণ আস্থা রেখে গেছেন। অন্যথায় অনেক বড় ধরনের পদস্খলনের আশঙ্কা রয়েছে।” [দ্র: মালফুযাতে ইলিয়াস (মাওঃ মনজুর নোমানী)]

সুতরাং এটা সর্বস্বীকৃত যে, তাবলীগ জামাত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শত বছর যাবত উম্মতের আস্থাভাজন উলামা ও মুফতীয়ানে কেরামের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও তাদের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়ে আসছে। তাবলীগের কাজটি খালেস দ্বীনী ও ধর্মীয় বিষয় হওয়ায় তার পরিচালনা আশ্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরসূরী হক্কানী প্রজ্ঞাশীল আলেমদের তত্ত্বাবধানে হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

তাবলীগের মূল নীতিমালা

১। দ্বীন এবং শরীয়তের ব্যাখ্যার ব্যাপারে এই জামাত (তাবলীগী জামাত) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাসলাক (নীতি আদর্শ) ও মতামত গ্রহণে বদ্ধপরিবর্তন। কুরআনে পাকের যে কোনো আয়াতের তাফসীর (ব্যাখ্যা) গ্রহণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরীন, হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসীন, সীরাতে নববী ও সীরাতে সাহাবায়ে কেরাম থেকে মাসআলা-মাসআইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ ও মুফতীগণের অনুকরণ অত্যাবশ্যিকীয়। এর ব্যতিক্রম করার অর্থই হলো, দ্বীনের মধ্যে তাহরীফ (দ্বীন বিকৃতি) এর দরজা খুলে দেয়া।” (দ্র: নিজামুদ্দিনের বিশেষ মুরুব্বি মাওঃ ইব্রাহীম দেওলার পত্র)

Page 2 of 34

- দারুল উলুম দেওবন্দ তাদের “সর্বসম্মত অবস্থান” নামে মাও. সাদ সাহেবের ব্যাপারে যে ফতোয়া জারী করেছে। সেখানেও সংক্ষেপে সাতটি বিভ্রান্তিকর উক্তি উল্লেখ করে মাও. সাদ সাহেবের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- অন্যদিকে মাও. সাদ সাহেবের অসংখ্য ভুল উক্তিগুলোকে সঠিক ও বলিষ্ঠ করার লক্ষ্যে তার অনুসারীগণও বিভিন্ন বই পুস্তক রচনা করেছেন।

তার পক্ষে লিখিত বইগুলোর মধ্যে:

- ১। মাও. মুহাম্মদ সালমান সাহেব কর্তৃক রচিত বইয়ের নাম **حضرت مولانا سعد صاحب پر ہونے والے اعتراضات کی تحقیق**
- ২। মুফতি মুহাম্মদ নদীম সাহেব কর্তৃক রচিত বইয়ের নাম **حضرت مولانا سعد صاحب پر ہونے والے اعتراضات کا منصفانہ جائزہ** উল্লেখযোগ্য।
প্রথম বইটিতে লেখক মাও. সাদ সাহেবের ১৮টি ভ্রান্ত বক্তব্যকে শক্তিশালী করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন।
দ্বিতীয় বইটিতেও ৩২টি বিতর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণ হলো যে, মাও. সাদ সাহেবের ভুল-ভ্রান্তি, আপত্তিকর উক্তি ও তার বিভ্রান্তিকর বিষয়গুলো বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের নিকট অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাই বিশ্বের হক্কানী উলামা সমাজের মাঝে এ নিয়ে লেখালেখি ও গবেষণার কোন অভাব নেই।

আমরা তার বিভ্রান্তিমূলক বিষয়গুলোর মধ্য হতে মাত্র উনিশটি ভ্রান্তির শরয়ী পর্যালোচনা ও সমাধানসহ নিম্নে উল্লেখ করছি। তার ভ্রান্তিগুলো যে কুরআন-সুন্নাহ, আসলাফ, আকাবিরসহ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত বিরোধী তা দলীলসহ প্রমাণ পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ!

[ভ্রান্তি নং এক]

(تفسیر بار ۱) বা কুরআনের মনগড়া তাফসীর)

মাওলানা সাদ কান্ধলভী হযরত ইউসুফ আ. এর ব্যাপারে **وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ** আয়াতশা'টি উল্লেখ করে কয়েকটি আপত্তিকর কথা বলেছেন- যেমন

ক. হযরত ইউসুফ আ. (জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য) গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের) থেকে সহযোগিতা চেয়েছেন।

খ. শয়তান ইউসুফ আ. কে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।

গ. আল্লাহ পাক তিরস্কার স্বরূপ হযরত ইউসুফ আ. কে দীর্ঘ মেয়াদে জেলে রেখেছেন, **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** [মাও. সাআদ সাহেব সে উলামায়ে উম্মত কী ইখতিলাফ কী বুনিয়াদী ওজুহাত: ১২; হযরতজী মাও. মুহাম্মদ সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ই'তিরায়াত কা মুনসিফানা জায়েযাহ: ৩৮; হযরত মাও. সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ই'তিরায়াত কী তাহকীক: ৬]

ভ্রান্তির খন্ডন

মাওলানা সাদ সাহেবের উপর্যুক্ত তিনটি কথার প্রত্যেকটিই আয়াতের অপব্যাখ্যা।

ক। প্রথম কথাটি দ্বারা যে কেউ বুঝে নিবে যে, কোন বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত সাধারণ উপকরণ গ্রহণ করা বা তা থেকে সহযোগিতা চাওয়া জায়েয নেই এবং তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। আর ইউসুফ আ. গাইরুল্লাহ থেকে সহযোগিতা নিয়ে গর্হিত বা অনুচিত কাজ করেছেন। অথচ সাহায্যকে আসবাবের স্তরে রেখে গাইরুল্লাহর নিকট মদদ চাওয়া দোষণীয় নয়। তবে গাইরুল্লাহকে সকল ক্ষমতার অধিপতি মনে করে সাহায্য চাওয়া অবৈধ। আসবাবের স্তরে রেখে গাইরুল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন-

- বাদশাহ যুলকারনাইন স্বজাতির নিকট সাহায্য চেয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَأَعْيُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۙ سورة الكهف: ৭৫

তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। (সূরা কাহাফ: ৯৫)

- আল্লাহ তাআলা ভালো ও কল্যাণকর কাজে একে অপরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (سورة المائدة: ২)

তোমরা সংকর্মে ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। (সূরা মায়দা: ২)

- হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল সা. নিজেই আনসারদের থেকে সাহায্য চেয়েছেন, উচ্চস্বরে দুবার ডাকলেন-

يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك (صحيح البخاري: رقم الحديث: ٤٣٣٧)

হে আনসারী সম্প্রদায়! (তোমরা আমাকে সাহায্য করো) তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমরা উপস্থিত। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমরা আপনার পাশে আছি। (সহীহ বুখারী: ৪৩৩৭)

- রাসূল সা. হযরত আব্বাস রা.কে আসহাবে সামুরাহকে সাহায্যের জন্য ডাকার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

فقال رسول الله ﷺ أي عباس ناد أصحاب السمره فقال عباس (وكان رجلا صيتا) فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمره قال فوالله لكان عطفهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك (صحيح مسلم: ١٦٧/٥)

আব্বাস রা. বলেন- আমি বলিষ্ট স্বরে আওয়াজ দিয়ে বললাম আসহাবে সামুরাহ কোথায়, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম তারা শোনামাত্র এমনভাবে ফিরে আসতে শুরু করলেন যেভাবে গাভী তার বাচ্চার আওয়াজ শুনে মমতাময়ী হয়ে দ্রুত দৌড়ে আসে। তারা বলতে লাগলো আমরা আপনার সামনে উপস্থিত।

খ। মাওলানা সাদ সাহেবের দ্বিতীয় কথাটি সম্পূর্ণ অপ্রণিধানযোগ্য তাফসীরের উপর ভিত্তি, কারণ তার বক্তব্য হলো কুরআনের আয়াত: فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَهُ এর অর্থ হলো শয়তান হযরত ইউসুফ আ. কে আল্লাহ পাকের স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। অথচ এর সঠিক ব্যাখ্যা হলো, শয়তান ইউসুফ আ. এর জেলের সাথী (যার স্বপ্নের ব্যাখ্যা তিনি করে দিয়েছিলেন) কে বাদশাহর কাছে হযরত ইউসুফ আ. এর কথা উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিয়েছিলো। কেননা, فَأَنسَاهُ শব্দের 'হ' সর্বনামটির "مرجع" প্রত্যাবর্তন স্থল হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী, হযরত ইউসুফ আ. নন। (দ্র. তাফসীরে কুরতুবী: ৫/২১১, কাছাছুল আম্মিয়া: ইবনে কাছির: ২০৩, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া: ১/২৪৬, বয়ানুল কুরআন: ৫/৭৯-৮১, তাফসীরে মাজেদী: ২/৬১০, মাআরেফুল কুরআন: মুফতি শফী রহ.: ৫/৫৫, কাছাছুল কুরআন: সিউহারাতী রহ.: ১/৩০৪)

ইবনে কাসির রহ. বলেন, فَأَنسَاهُ এর সর্বনামটি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিকে ফিরেছে। এটাই সঠিক তাফসীর। তবে কেউ কেউ ভিন্ন মতও পোষণ করেছেন। কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/৩৫২)

গ। এমনভাবে তৃতীয় কথাটি বলেছেন যে, আল্লাহ পাক তিরস্কার বা শাস্তিস্বরূপ দীর্ঘ মেয়াদ হযরত ইউসুফ আ. কে জেলে রেখেছেন, তার এই উক্তি নবী ও রাসূলগণের শানে বেয়াদবী। তিনি অত্যন্ত দুর্বল একটি হাদীসকে পুঁজি করে আপত্তিকর এ উক্তিটি করেছেন। হাদীসটি হলো-

عن ابن عباس مرفوعا قال: قال النبي ﷺ: لو لم يقل يعني يوسف الكلمة التي قال: ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند الله. এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে এসেছে সবগুলো সনদই অগ্রহণযোগ্য।

- ইমাম ইবনে কাছির এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেছেন-

وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف، وإبراهيم بن يزيد -هو الخوذي- أضعف منه أيضا. وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلًا عن كل منهما، وهذه المرسلات هاهنا لا تقبل لوقيل المرسل من حيث هو في غير هذا الموضع.

এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা, এর রাবী সুফিয়ান বিন ওয়াকী দুর্বল এবং আরেক রাবী ইবরাহীম বিন ইয়াযিদ অত্যন্ত দুর্বল। হাদীসটি হাসান এবং কাতাদা সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। হাসান এবং কাতাদা উভয়ের হাদীসগুলো মুরসাল। অন্যত্র মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হলেও এখানে মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয়। (তাসফীরে ইবনে কাসীর: ২/৬২৪)

- ইমাম আহমদ বলেন: ইবরাহীম বিন ইয়াযিদের হাদীস পরিত্যাগযোগ্য (متروك)। (তাহযীব: ২/২৪৩)

- ইবনে মাজিন বলেন- তিনি নির্ভরযোগ্য নন। (তারিখে ইবনে মাজিন: ২/১৪)

- ইবনে আবি হাতিম বলেন- তার হাদীস দুর্বল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৬২৪) (আল জারহ ওয়াত তাদিল: ১/১৪৭)

- সুফিয়ান বিন ওয়াকী সম্পর্কে ইমাম আবু যাহরা মিসরী লিখেছেন- لا يجوز الاحتجاج به أبداً

অর্থাৎ এ জাতীয় হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া কোনক্রমেই জায়েয নাই। (আল ইসরাঈলিয়াত: ২৩০)

মোটকথা: উপরোক্ত হাদীসটির সকল রাবী খুবই দুর্বল। এ কারণে হাদীসটি প্রমাণযোগ্য নয়। তার উপর ভিত্তি করে কোন নবীর শানে অসম্মানজনক উক্তি করা চরম বেয়াদবী যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শ পরিপন্থী এবং আয়াতের অপব্যাখ্যা। এই উক্তির ভিত্তি হচ্ছে- একমাত্র ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ যা আহলে কিতাবদের উদ্ভট উদ্ভাবন। (কাসাসুল কুরআন, আল্লামা হিফজুর রহমান)

সঠিক কারণ:

হযরত ইউসুফ আ. এর দীর্ঘকাল জেলে থাকার সঠিক কারণ সম্পর্কে হযরত থানভী রহ. বলেছেন, দীর্ঘ মেয়াদ জেলে থাকা তিরস্কার স্বরূপ নয়; বরং শুধু হযরত ইউসুফ আ. এর জেলের সাথী তার কথা বাদশাকে বলতে ভুলে যাওয়ার কারণে এমন হয়েছে। এটাই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা। (বয়ানুল কুরআন: ৫/৭৯-৮১)

[ভ্রান্তি নং দুই]

وَكَبُّهُمْ بِأَسِطٍ ذَرَأَعِيهِ بِالْوَصِيدِ (سورة الكهف: ١٨)

মাও. সাদ সাহেব বলেন, আসহাবে কাহাফের সাথে যে পশুটি ছিল তা কুকুর নয়, বাঘ। [মাও. সাআদ সাহেব সে উলামায়ে উম্মত কী ইখতিলাফ কী বুনিয়াদী ওজুহাত: ১৩, হযরতজী মাও. মুহাম্মদ সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ইতিরাযাত কা মুনসিফানা জায়েযাহ: ২৬]

ভ্রান্তির খন্ডন

মাও. সাদ কান্ধলভীর উপরোক্ত কথাটি কুরআনের আয়াতের সুস্পষ্ট বিকৃতি। সূরা কাহাফের ২২ নং আয়াতে **كَبُّهُمْ** “তাদের কুকুর” শব্দটি তিন বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে আসহাবে কাহাফের সংখ্যা নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও তাদের সাথে পশুটি নিয়ে কোন মতভেদ নেই। আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, পশুটি কুকুর ছিল, বাঘ নয়।

- মুফাসসিরীনে উলামায়ে দেওবন্দের সকলেই **كَبُّهُمْ** শব্দের অর্থ কুকুর লিখেছেন, কেউ ‘বাঘ’ লিখেননি। (দেখুন: বয়ানুল কুরআন- আশরাফ আলী থানভী রহ., মাআরিফুল কুরআন- মুফতি শফী রহ., তাফসিরে উসমানী- আল্লামা শিবির আহমদ উসমানী রহ., মাআরিফুল কুরআন ইদ্রিস কান্ধলভী রহ., তাওযিহুল কুরআন মুফতি তাকী উসমানী।)
- ইলমে তাফসীরের মূল গ্রন্থগুলো দেখলে তাতেও দেখা যায় “কালবুন” শব্দের অর্থ “কুকুর” করা হয়েছে। তবে কোন কোন তাফসীরগ্রন্থে ভিন্ন অর্থ করা হলেও তা যে দুর্বল মত আর কুকুর অর্থটি যে বিশুদ্ধ তাও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে সে ভিন্ন অর্থগুলোর মধ্যেও **كَلْب** এর অর্থ ‘বাঘ’ কেউ করেননি। যেমন-
- তাফসীরে বাগাবীতে ‘কালবুন’ এর অর্থ জমছুর উলামার দৃষ্টিতে কুকুর এবং এটাই বিশুদ্ধ মত উল্লেখপূর্বক লিখেছেন-

وروي عن ابن جريج: أنه كان أسد أو سمي الأسد كلباً (تفسير البغوي: ٤/٤٨٠)

ইবনে জুরাইজ থেকে (দুর্বল সূত্রে) ‘কালবুন’ এর অর্থ ‘আসাদুন’ বর্ণিত হয়েছে। আর আসাদকে এখানে কালবুন এর নাম দেয়া হয়েছে। (উল্লেখ্য অভিধান মতে **أسد** (আসাদ) অর্থ হচ্ছে সিংহ।)

- তাফসীর দুররে মানসুর এবং তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম রাযিতে বিষয়টি এভাবে উত্থাপিত হয়েছে-

عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: "زَعَمُوا أَنَّ كَلْبَهُمْ كَانَ أَسَدًا، قَالَ: لَعَمْرُ اللَّهِ مَا كَانَ أَسَدًا، وَلَكِنَّهُ كَانَ كَلْبًا أَحْمَرَ خَرَجُوا بِهِ مِنْ بَيْتِهِمْ، يُقَالُ لَهُ: قَطْمِيرٌ." (تفسير ابن حاتم: ١٩٢/٩)

অর্থাৎ ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি একজন বিজ্ঞ আলেমকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, অনেকে মনে করেন তাদের পশুটি নাকি সিংহ/বাঘ ছিল?। তিনি বলেন আল্লাহর কসম সেটি সিংহ/বাঘ ছিল না। কিন্তু লাল বর্ণের কুকুর ছিল। তারা সেটাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিল সেটিকে “কিতমির” ডাকা হতো। (তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম: ৯/১৯২)

মোটকথা: উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল ইবনে জুরাইজ রহ. অন্য লোকদের ধারণার কথা বিজ্ঞ আলেমের নিকট ব্যক্ত করলে তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য উপরোক্ত বিষয়টি ছিলো “আসাদুন” শব্দকে কেন্দ্র করে, আর **أسد** (আসাদুন) শব্দের অর্থ সিংহ, বাঘ নয়। বাঘকে অভিধানে **ذئب** (যি’বুন) বলা হয়েছে। বোঝা গেল আসহাবে কাহাফের সাথে পশুটি বাঘ ছিল একথা তাফসীর গ্রন্থে কোন দুর্বল বর্ণনাও পাওয়া যায় না। আর সিংহের অর্থটিও অজ্ঞাত লোকদের ধারণা এবং অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনার উপর ভিত্তি হওয়ায় তা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের কাছে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যাত। এমন দুর্বল, ভিত্তিহীন ধারণার উপর মাও. সাদ কান্ধলভী কর্তৃক আয়াতের ব্যাখ্যাটি জমছুর মুফাসসিরীনের বিরুদ্ধে অবস্থান। উপরন্তু এটাকে বারবার উল্লেখ করে ভিত্তিহীন তাফসীরকে সঠিক তাফসীর বলে মানুষকে ধারণা দেয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নীতি আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক ও কুরআনের অর্থ বিকৃতি।

[ভ্রান্তি নং তিন]

মাও. সাদ কান্ধলভী নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, “আল্লাহ রাস্তায় সকলেই বের হবে না, এ কথা নিম্নোক্ত আয়াতে কোথাও নেই।”

সূরা তাওবাত্তে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (سورة التوبة: ١٢٢)

মাও. সাদ বলেন- “যদি চিন্তা করা হয় তাহলে বোঝা যাবে যে, এই মুমিনদের দ্বারা ঐ সকল আলেম বা ঐ সকল হযরত উদ্দেশ্য, যাদের উপর দ্বীনের কোন শাখার জিহাদাদারী রয়েছে। আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা নিবেদন করছি। যদি এই আয়াতে চিন্তা করা হয়, তাহলে (বোঝা যাবে) যাদেরকে বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তারা ঐ সকল হযরত যাদের উপর দ্বীনের কোন শাখার দায়িত্ব রয়েছে। এ কথাতো কোথাও নেই, সবাই বের হবে না। হযরত উবাই ইবনে কা'বকে ক্বারীগণের সরদার বলা হয়। তার এক বছরের খুরুজ ছুটে গিয়েছিলো, এ জন্য তিনি অত্যন্ত অনুশোচনা করতেন।” [মাও. সাআদ সাহেব সে উলামায়ে উম্মত কে ইখতিলাফ কী বুনিয়াদী ওজুহাত: ১৯]

ভ্রান্তির খন্ডন

এই বয়ানটি তিনি “রুজুর” দাবী করার পর সাম্বালের ইজতেমায় উলামাদের উদ্দেশ্যে পেশ করেছেন। এখানে তিনি কয়েকটি ভুল করেছেন-

প্রথম ভুল: আয়াতের মনগড়া তাফসীর করেছেন। আয়াতের সঠিক তাফসীর হল-

ক. মুমিনদের একদল জিহাদে বের হয়ে যাবে, সবাই যাবে না। বাকীরা এলাকায় থেকে ইলমে দীন ও তাফাক্কুহ অর্জন করবে।
খ. মুমিনদের একদল ইলমে দীন ও তাফাক্কুহ অর্জন করার জন্যে বের হবে, বাকীরা এলাকায় থেকে চাষাবাদ ও উপার্জন করবে। তারা এসে এদেরকে দীন শিখাবে। [তাফসীরে রুহুল মাআনী: ১১/৬৬-৬৭]

উক্ত আয়াতে এই দুই প্রকারের তাফসীরেরই সম্ভাবনা আছে এবং বর্ণিত আছে। এর বিপরীতে মাও. সাদ সাহেব যে তাফসীর করেছেন সেটি দেড় হাজার বছর পর্যন্ত কোন মুফাসসির করেননি এবং আয়াতে তার সম্ভাবনাও নেই। সেটি তার নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত ভুল ব্যাখ্যা ও আয়াতের অপপ্রয়োগ। অথচ নিজস্ব মতাদর্শ প্রমাণ করার জন্যে আয়াতের এমন অপপ্রয়োগ করা শরয়ী দৃষ্টিতে হারাম। এটাই মনগড়া তাফসীর বা *تفسير بالرأى*।

দ্বিতীয় ভুল: তিনি বলেছেন “এ কথাতো কোথাও নেই সবাই বের হবে না।”

উক্ত আয়াতে মুমিনদের বড় দল “فرقة” থেকে ছোট একটি দল “طائفة” বের হতে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা সবাই বের হওয়ার কথা দৃঢ়ভাবে দাবী করেছেন। অথচ এটা আয়াতের মর্মও না এবং শরীয়ত সমর্থিতও নয়। কারণ দ্বীনের শাখাগত কোন একটি কাজে যদি সবাই লেগে যায় তাহলে ইসলামের অন্যান্য শাখাগুলোর কাজ আঞ্জাম দেবে কে? দেখুন:

- তাফসীরে রুহুল মাআনীতে বলা হয়েছে-

وماكان المؤمنین لينفروا كافة أي ما إستقام لهم أن يخرجوا إلى الغزو جميعا... والمراد منهم عن النفير جميعا لما فيه من الإخلال بالتعلم (روح المعاني: ১০/১০)

অর্থাৎ সদলবলে সকলেই জিহাদে চলে যাওয়া সঠিক পথ নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাই যাওয়া নিষেধ। কারণ এতে ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা দিবে। (রুহুল মাআনী: ১০/৪১২)

- তাসফীরে বাগভীতে আছে-

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا بَعْدَ الْغَزْوِ كُلِّ فِرْقَةٍ إِلَى عَظِيمَةٍ يَعْنِي إِلَى الْغَزْوِ وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مَعَ النَّبِيِّ لِيَتَفَقَّهُوا أَيِ الْعَاقِدُونَ فِي الدِّينِ أَيِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ (مكتبة تقي: ১২৬/৩)

মর্মার্থ, সব বড় দল থেকে একটি ছোট দল নবীজির সাথে থেকে কুরআন সুন্নাহর আহকাম শিখবে, আরেকটি দল জিহাদে যাবে। সদলবলে সবাই চলে যাওয়া সঠিক নয়। (গুলদাস্তায়ে তাফাসীর: ৩/২২৬)

তৃতীয় ভুল: “হযরত উবাই ইবনে কা'বের এক বছরের খুরুজ ছুটে গিয়েছিল, তাই তিনি অত্যন্ত অনুশোচনা করতেন।”

এটা একটা মৌলিক ভুল। সাহাবায়ে কেরামের সফর ও খুরুজ ছিলো জিহাদের জন্য। এটা বর্তমান তাবলীগের কোন বাৎসরিক তারতীব বা নিয়মের বিষয় ছিলো না। যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে রাসূল সা. নগদ তাশকীল করে জিহাদের জন্য পাঠিয়েছেন। কখনো একই বৎসরে কয়েকবার যেতে হয়েছে। কখনো লাগাতার কয়েক বছরেও কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। এ জাতীয় জিহাদের সফর সংক্রান্ত ঘটনাসমূহকে মাও. সাদ সাহেব দাওয়াত-তাবলীগের নেসাবী চিল্লার সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। যা মনগড়া ব্যাখ্যা, শরীয়তের পরিভাষার চরম বিকৃতি এমনকি মনগড়া তাফসীরও বটে।

[ভ্রান্তি নং চার]

মাও. সাদ কান্দলভী সাহেব প্রায় বলে থাকেন- মুফাসসিরীন এ আয়াতের এক তাফসীর করেছেন, উলামারাও কোন এক তাফসীর করে থাকেন, কিন্তু আমি তার এই তাফসীর করে থাকি। এটা শোন, এটাই সঠিক তাফসীর।” (বিভিন্ন বয়ানের রেকর্ড দ্রষ্টব্য ও তার বক্তব্য কেন্দ্রীক পুস্তিকা)

ভ্রান্তির খন্ডন

মাও. সাদ কান্দলভীর এ উক্তিটা মারাত্মক বিভ্রান্তিকর। কারণ তার এই উক্তির মাঝে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, একমাত্র তার তাফসীরটিই সঠিক, আর অন্য সকল মুফাসসিরের তাফসীর বেঠিক, বিশেষভাবে তার দান্তিকতাপূর্ণ উক্তি: “এটা শোন, এটাই সঠিক তাফসীর” বাক্যটি চরম আপত্তিকর। কারণ এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনসহ পূর্ব যুগের সকল আকাবির ও আসলাফের তাফসীর ভুল সাব্যস্ত হয়। তাহলে কি মাও. সাদ জন্ম হওয়ার পূর্ববর্তী সকলেই কুরআনের ভুল তাফসীর করে গেছেন? তাছাড়া “আমি এই তাফসীর করে থাকি” তার এই বাক্যটি মনগড়া তাফসীরের দিকেই ইঙ্গিত বহন করছে। কারণ সালাফ ও খালাফ সকলের বিপরীতে তার মত ব্যক্তির তাফসীর সঠিক হতেই পারে না। এর প্রমাণ তো উপরোক্ত ভ্রান্তিসমূহ।

- আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (القيامة: ১৮-১৯)

অর্থ: অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। এরপর বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদান আমারই দায়িত্ব।

বোঝা গেল প্রত্যেক যুগেই কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানকারী উলামাদের একটি দল আল্লাহ পাক দুনিয়াতে রেখেছেন। অথচ মাও. সাদ সাহেবের উক্তির মর্ম দাঁড়ায় অন্যদের সব তাফসীর ভুল, সঠিক তাফসীরকারক পূর্বে কেউ ছিলো না।

- রাসূল সা. বলেছেন-

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের বিরুদ্ধাচরণকারী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী: ১৯২০)

এখন যদি কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যাকারী পূর্ব যুগে বিদ্যমান নাই থাকে তাহলে হকপন্থী দলটা থাকল কোথায়? এবং সে ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসের অর্থ কি হবে?

সঠিক কথা হলো-

- ১। সাহাবাগণের জামাত থেকে অদ্যবদি সর্বকালেই কুরআন হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানকারী হকপন্থী দল ছিলো আছে এবং থাকবে। সুতরাং মাও. সাদ কান্দলভী প্রায় দেড় হাজার বছর পর এসে একমাত্র নিজের তাফসীরকে সঠিক দাবী করা একটি চরম গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা বৈ কিছু না।
- ২। উপরন্তু মাও. সাদ কান্দলভী একমাত্র সঠিক তাফসীরের দাবি করে যত নব্য তাফসীর পেশ করেছেন তার প্রায় সবগুলোই হল তাফসীর বির রায়, তথা মনগড়া তাফসীর। এসব তাফসীরের মাধ্যমে তিনি হযরত ইউসুফ আ., হযরত মুসা আ., হযরত যাকারিয়া আ. সহ বহু নবীগণকে বিভিন্ন দোষে অভিযুক্ত করেছেন। সাহাবাদের শানে বেয়াদবীমূলক উক্তি করেছেন। কুরআনের মনগড়া তাফসীর করে আয়াতের বিকৃতি ঘটিয়েছেন এবং নবী রাসূলগণের ইসমত তথা নিস্পাপ হওয়ার সর্বস্বীকৃত আকীদার উপর আঘাত করেছেন। যা সম্পূর্ণভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার পরিপন্থী।

মনগড়া তাফসীর সম্পর্কে রাসূল সা. এর বহু সতর্কবাণী রয়েছে।

- যেমন রাসূল সা. এরশাদ করেন-

عن ابن عباس . قال : قال رسول الله ﷺ : " من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ عقده من النار "

যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় ইলম ছাড়া কথা বলবে সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল। (তিরমিযী-৪০২৩, আবু দাউদ-৩৬৫২)

- রাসূল সা. আরো বলেন-

" من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ "

যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া কথা বলবে এবং ঘটনাক্রমে তা সঠিক হয়ে গেলেও ভুল ব্যাখ্যা গণ্য হবে এবং সে গোনাহগার হবে। (সুন্নে তিরমিযী-৪০২৫)

- আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. মনগড়া তাফসীর সম্পর্কে বলেন-

শুধুমাত্র নিজস্ব চিন্তাধারায় তাফসীর করা সম্পূর্ণ হারাম। (মুকাদ্দামা ফী উসুলিত তাফসীর: ১০৫)

● শাইখ মান্না আল কাত্তান লিখেছেন-

وتفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل حرام لا يجوز تعاطيه قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم (مباحث في علوم القرآن: ৩৫২)

ভিত্তিহীন ইজতিহাদ বা নিছক নিজের চিন্তাধারার ভিত্তিতে কুরআনের তাফসীর করা সম্পূর্ণ হারাম। তাছাড়া মনগড়া তাফসীর করার ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ের পিছে পড়ো না। (মাবাহেস ফি উলুমিল কুরআন: ৩৪২)

উল্লেখ্য তাফসীর বির রায় (تفسير بالرأي) এর মূল মর্মার্থ হলো “যে তাফসীর নিজের পক্ষ থেকে প্রবৃত্তির তাড়নায় করা হয় যার মাধ্যমে শরীয়তের কোন দলীল, ইজমা দ্বারা প্রমাণিত কোন মাসআলা, ফতোয়া, পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সালাফের ঐক্যবদ্ধ আকীদার পরিপন্থী হয়, তাকে মনগড়া তাফসীর বলা হয়।” (ইসতিলাহাতে উসুলে তাফসীর: ইফতিখার আহমদ কাসেমী পৃ. ১৯)

উপরন্তু অনেক জায়গায় মাও. সাদ কান্দলভী জমহুর মুফাসসিরীনের বিশুদ্ধ তাফসীরের বিপরীতে মারাত্মক দুর্বল ও মারজুহ বর্ণনা এবং ইসরাঈলী বর্ণনার উপর নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। অথচ আল্লামা শামী রহ. বলেন-

وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للاجماع.

অগ্রাধীকারপ্রাপ্ত নয় এমন অভিমতের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেয়া বা মাসআলা বলা অজ্ঞতা এবং ইজমা তথা ঐক্যমতের লঙ্ঘন। (শামী: ১/৫৫)

● আল্লামা শামী রহ. আরো বলেন-

إن المرجوح في مقابلة الراجح بمثله العدم والترجيح بغير مرجح في المقابلات ممنوع

অগ্রাধীকারপ্রাপ্ত মতের বিপরীতে অগ্রাধীকারপ্রাপ্ত নয় এমন মতামতকে অস্তিত্বহীন বলে গণ্য করা হবে। আর কোন মতকে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া (শক্তিশালী) মতামতের উপর প্রাধান্য দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। (শরহে উকুদে রসমুল মুফতী: পৃ. ১০০)

মোটকথা, মাও. সাদ কান্দলভীর “এটা আমার মত এটা শোন, আমি আয়াতের এই ব্যাখ্যা করি, এটাই হক ও বিশুদ্ধ” উক্তি করে যে সব তাফসীর করেছেন তা অধিকাংশই অপব্যখ্যা বা মনগড়া ব্যাখ্যা। এ জাতীয় বিচ্ছিন্ন মতাদর্শ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। اعاذنا الله من ذلك

[ভ্রান্তি নং পাঁচ]

মাও. সাদ কান্দলভী বলেন- “পারিশ্রমিক নিয়ে দ্বীন শিক্ষা দেয়া দীনকে বিক্রয় করার নামান্তর। কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণকারীদের পূর্বে যিনাকারীরা জান্নাতে চলে যাবে।” [মাও. সাআদ সাহেব সে উলামায়ে উম্মত কী ইখতিলাফ কী বুনিয়াদী ওজুহাত: ১২-১৩, হযরতজী মাও. মুহাম্মদ সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ইতিরাযাত কা মুনসিফানা জায়েযাহ: ৪৯, হযরত মাও. সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ইতিরাযাত কী তাহকীক: ১৫, সাআদত নামা: ৬]

ভ্রান্তির খন্ডন

এই উক্তিটি বিভ্রান্তিকর কুরুচিপূর্ণ, শিষ্টাচার বিবর্জিত, উলামায়ে কেরামের তাআমুল (কর্মধারা) এবং চার মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরামের ঐক্যবদ্ধ ফতোয়া বিরোধী বক্তব্য এবং এই উক্তিটির ভিত্তি একটি জাল ও অপ্রমাণিত বর্ণনার উপর।

শরীয়তের বিধান হলো, যে সব দ্বীনি কাজ জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যে বিষয়গুলো কোন কারণে সমাজ থেকে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে গেলে দ্বীনের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, এমন দ্বীনি কাজের বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ ও প্রদান সম্পূর্ণ বৈধ ও হালাল।

ইমাম মালেক রহ., শাফেয়ী রহ., আহমদ বিন হাম্বল রহ. সহ তিনটি মাযহাবের ফকীহগণ কুরআন-হাদীস শিক্ষা, ইমামতি, আযান ইত্যাদির বিনিময় গ্রহণকে জায়েয বলেছেন। হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী ফকীহগণ প্রথমে এই পারিশ্রমিককে অবৈধ আখ্যা দিলেও পরবর্তী যুগের হানাফী সকল ফকীহ ও ইমামগণ অন্যান্য মাযহাবের সাথে একমত পোষণ করে সকলেই এটাকে বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। এরপর থেকে বিশ্বের কোন মুফতি, ফকীহ ও ইমাম এ ব্যাপারে আর দ্বিমত পোষণ না করায় বিষয়টির উপর “ইজমা” বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। অথচ মাও. সাদ কান্দলভী উলামায়ে উম্মতের এই ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে হালালকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়ে দ্বীন বিকৃতির পথ অবলম্বন করেছেন।

- ইমাম মালেক রহ. বলেন-

وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن

এই হাদীসের (অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস (رقية بفاتحة) মাধ্যমে কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হল। (ফাতহুল বারী: ৯/২১৩)

- ইবনে হাজার শাফেয়ী রহ. লিখেন-

واستدل به للجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن

ইমাম বুখারী রহ. জমহুর উলামায়ে কেরামের পক্ষে এ হাদীস (তথা আবু সাঈদ খুদরী রা. কর্তৃক الرقية بالفاتحة) এর মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে বৈধ হওয়ার দলীল পেশ করেছেন। (ফাতহুল বারী: ৪/৪৫৪)

- মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম নববী রহ. লিখেছেন-

هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القرآن وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم

এ হাদীস স্পষ্ট করছে যে সুরা ফাতিহা ও যিকিরের মাধ্যমে ঝাড়-ফুক করে পারিশ্রমিক নেয়া নিঃসন্দেহে বৈধ। অনুরূপভাবে কুরআনের তালিম দিয়ে বেতন গ্রহণ করা বৈধ। এটাই ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, ইমাম আবু ছাওরসহ আরো অনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মায়হাব। (শরহে নববী: ২/২২৪)

- হানাফী মায়হাবের বিশিষ্ট ফকীহ ইমাম কাযিখান বলেন-

فقلنا بصحة الإجارة ووجوب الأجرة للمعلم بحيث لو امتنع الوالد عن إعطاء الأجر حبس فيه

কুরআন শিক্ষার উপর বেতন নেয়ার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, শিক্ষার বিনিময়ে বেতন নেয়া সহীহ ও বৈধ। বেতন নির্ধারণ হলে তা শিক্ষককে পরিশোধ করা ওয়াজিব। এমনকি যদি শিক্ষকের বেতন ছাত্রের অভিভাবক পরিশোধ না করে তাকে বন্দি করে হলেও বেতন আদায় করা যাবে। (ফতোয়ায়ে কাযি খান: ৩/৪৩৪)

- ইমাম ইবনে নুজাইম আল মিসরী আল হানাফী বলেন-

فيجوز أخذ الأجر للإمام والمؤذن والمعلم والمفتي

ইমাম মুয়াজ্জিন (কুরআনের) শিক্ষক ও মুফতিদের বেতন ভাতা গ্রহণ করা জায়েয। (আল বাহুরর রায়েক: ১/২৫৪)

- আল্লামা শামী বলেন-

جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم اهل التخرج والترجيح فافتوا بصحته على تعليم القرآن للضرورة فلولم يصح الاستئجار واخذ الأجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين

(হানাফী মায়হাবের) পরবর্তী মুজতাহিদগণ -যাদেরকে আসহাবুত তাখরীজ ওয়াত তাসহীহ বলা হয়- জরুরতের ভিত্তিতে কুরআন শিক্ষার উপর বেতন নেয়ার বৈধতার উপর ফতোয়া জারি করেছেন। কেননা যদি তা অবৈধ করা হয় তাহলে কুরআন শিক্ষা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর কুরআন শিক্ষা বিলুপ্ত হওয়া গোটা দ্বীন বিলুপ্ত হওয়ার নামান্তর। (শরহে উকুদে রসমিল মুফতি: ৬৪-৬৫)

মাও. সাদ কান্দলভীর এই উক্তির ভিত্তি কোথায়?

‘হায়াতুস সাহাবার’ একটি বর্ণনাকে তার উক্ত মতের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেহেতু এই মাসআলা খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের তরীকা, উলামায়ে কেরামের তা’আমুল ও চার মায়হাবের ফতোয়া দ্বারা প্রমাণিত। তাই এসবের বিরুদ্ধে হযরত উমর রা. এর একটি বর্ণনার দোহাই দিয়ে (যদি তা সঠিকও হত) নিজের মনমত ফতোয়া তার জন্য দেওয়া বৈধ হতো না। অথচ বর্ণনাটি নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণযোগ্য নয়:

১. এই বর্ণনার সনদে (معلی بن هلال) মুয়াল্লা বিন হেলাল নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। হাদীস বিশ্লেষকগণ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব: ৩/৩৩৬) তাই উক্ত বর্ণনাটি জাল ও ভিত্তিহীন।
২. উক্ত বর্ণনাটি হযরত উমর রা. থেকে মুজাহিদ বর্ণনা করেন। হযরত উমরের ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিলো দুই বছর। তাই এটা স্পষ্ট, তিনি হযরত উমর রা. থেকে শুনেননি। অতএব এটি منقطع (বিচ্ছিন্ন)। এ হলো বর্ণনাসূত্রের অবস্থা।
৩. স্বয়ং বর্ণনার ভাষ্যই এখানে বিকৃত। ‘হায়াতুস সাহাবায়’ উল্লেখ রয়েছে إلى الجنة অর্থাৎ যিনাকারীরা তোমাদের আগে জান্নাতে চলে যাবে। এই বর্ণনার মূল সূত্র হলো খতীবে বাগদাদী রচিত ‘আল জামে লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে’: ১/১৫৬। সেখানে এ বর্ণনার মূল ভাষ্য হলো الجنة إلى الدناءة বর্ণনার আসল ভাষ্যে শব্দ ছিলো الدناءة যার অর্থ,

নিম্নস্তরের লোক। আর ‘হায়াতুস সাহাবা’তে এসে এর ভাষ্য হলো الزينة যার অর্থ যিনাকারী। যে কোন কারণেই হোক ‘হায়াতুস সাহাবা’তে ভাষ্যটি পাল্টে গেছে।

৪. তাছাড়া অর্থগতভাবেও এই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এই বর্ণনার মর্ম হলো, হযরত উমর রা. কুরআন শরীফের পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ হযরত উমর রা. নিজেই কুরআন শরীফের শিক্ষকদের জন্য ভাতা চালু করেছেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা যা একটি দ্বীনি কাজ তার বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজে আবু বকর রা. কেও ভাতা নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছেন। এর প্রমাণ হাদীসের কিতাবে ভরপুর। যদি কিছুক্ষণের জন্য প্রমাণিত ধরেও নেওয়া হয় তাহলে এর মর্ম হবে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে পারিশ্রমিক নেওয়া। কুরআন শরীফ শিক্ষাদানের পারিশ্রমিক নেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ কুরআন তিলাওয়াত আর কুরআন শিক্ষা এক কথা নয়, একটি নাজায়েয অপরাধ জায়েয। মাও. সাদ কান্দলভী মনে হয় কুরআন তিলাওয়াত করে বিনিময় নেয়া আর কুরআন শিক্ষা দিয়ে বেতন নেয়া উভয়টিকে গুলিয়ে এক করে ফেলেছেন।

[ভ্রান্তি নং ছয়]

মাও. সাদ কান্দলভী বলেন- “কুরআন বুঝে পড়া ওয়াজিব, ওয়াজিব, ওয়াজিব। তরজমা না জেনে তিলাওয়াত করলে ওয়াজিব তরকের গোনাহ হবে।” [মাও. সাআদ সাহেব সে উলামায়ে উম্মত কী ইখতিলাফ কী বুনিয়াদী ওজুহাত: ১২, হযরতজী মাও. মুহাম্মদ সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ইতিরাযাত কা মুনসিফানা জায়েযাহ: ৪৫, হযরত মাও. সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ইতিরাযাত কী তাহকীক: ১৩, সাআদত নামা: ৬]

ভ্রান্তির খন্ডন

এই উক্তিটি কুরআন হাদীস বিরোধী ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক এবং উম্মাহর সকল ফকীহ ও মুফতিয়ানের ফতোয়ার সাথেও বিরোধপূর্ণ। মনগড়া এই ফতোয়ার প্রেক্ষিতে দুটি আজগুবি দাবী করা হয়েছে।

১। কুরআন শরীফ বুঝে শুনে তিলাওয়াত করা ওয়াজিব।

২। তরজমা না জেনে তিলাওয়াত করা ওয়াজিব তরক করার মত কবীরা গুনাহ।

বাস্তবতা হচ্ছে শুধু কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল সা. এর উপর স্বতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আর কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা তথা কুরআনের ইলমের তালিম এটাও স্বতন্ত্র রাসূল সা. এর দায়িত্ব। ইরশাদ হচ্ছে-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

হে আমার রব! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন। যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন ও তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। (সূরা বাকারা-১২৯)

- এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী রহ. লিখেছেন-

وذلك لأن التلاوة مطلوبة لوجوه : منها بقاء لفظها على ألسنة أهل التواتر فيبقى مصوناً عن التحريف والتصحيف ، ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجزاً لمحمد ﷺ ، ومنها أن يكون في تلاوته نوع عبادة وطاعة ، ومنها أن تكون قراءته في الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة . (تفسير الرازي: ٣٥٧/٢)

অর্থ, আয়াতে উল্লিখিত يتلو শব্দ থেকে শুধু তিলাওয়াত উদ্দেশ্য (অর্থ বোঝা নয়) কয়েক কারণে। যথা:

১। অসংখ্য মানুষের যবানে যেন কুরআনের আলফায জারি থাকে যাতে শব্দ বাক্যগুলোতে বিকৃতি না ঘটে।

২। কুরআনের আলফায এবং উচ্চারণই রাসূল সা. এর মুজিয়া।

৩। কুরআনের শুধু তিলাওয়াতই ইবাদত ও মহৎ কাজ। (অর্থ বুঝা শর্ত নয়।)

৪। প্রত্যেক নামাযে এবং অন্যান্য ইবাদতে কুরআন তিলাওয়াতটিই স্বতন্ত্র একটি ইবাদত। (তাফসীরে কাবীর: ৪/৬০)

- কুরআনের সংজ্ঞা নিয়ে বিজ্ঞ উসুলীগণ যত আলোচনা করেছেন সকলেই বলেছেন-

القرآن كلام الله، المعجز المنزل على محمد ﷺ المتعبد بتلاوته (التبيان في علوم القرآن: ١١)

অর্থ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর মুজিয়াপূর্ণ কালাম, যা নাযিল হয়েছে মুহাম্মদ সা. এর উপর। যার শুধু তিলাওয়াতই হচ্ছে স্বতন্ত্র ইবাদত।

আর সকল আলেমদের ঐক্যমতে কুরআনের অর্থকে কুরআন বলা যায় না।

- আল্লামা মান্নাউল কাত্তান রহ. লিখেছেন-

لأن ترجمة القرآن ليست قرآنًا... وأما الأحناف... وهم متفقون على أن الترجمة لا تسمى قرآنًا. (مباحث في علوم القرآن: ٣٢٠)

কুরআনের অর্থ কুরআন নয়। হানাফী উলামাসহ গোটা উম্মাহর সকল আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনের অর্থকে কুরআন বলা চলে না। তাহলে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে অর্থ বোঝার শর্ত আসবে কীভাবে?

- কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও রাসূলের হাদীসে কুরআনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র দুটি শব্দ এসেছে “তিলাওয়াত” এবং “কিরাআত”। যেমন কুরআনে কারীমে এসেছে-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ (الاعراف: ২০)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ (فاطر: ২৯)

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (الانفال: ২)

- হাদীসে এসেছে

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة. (سنن أبي داود: ১৪০০)

اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه (صحيح مسلم: ৪০৬)

من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة (سنن الترمذی: ২৯১০)

এ দুটি শব্দের প্রত্যেকটির মাধ্যমে আয়াতের উচ্চারণ, পাঠকেই বুঝানো হয়েছে। আর কুরআনের অর্থকে কুরআন বলা হয় না। তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই কুরআন তিলাওয়াত বা পাঠের মর্ম হচ্ছে তার শব্দ বাক্যবলীর উচ্চারণ, পাঠ ও তিলাওয়াত। এখানে অর্থের কোন প্রয়োজন নেই।

- সাহাবাগণের যুগ থেকে এখন পর্যন্ত কোন সাহাবী, তাবেরী, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির কুরআন তিলাওয়াত বা কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে অর্থও তার অন্তর্ভুক্ত এমন কথা কেউ বলেননি। মাও. সাদ কান্দলভীই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই নব্য ফতোয়া আবিষ্কার করলেন।
- কোটি কোটি মানুষ এমন আছেন যারা কুরআনের অর্থ বুঝেন না। অথচ তাদের পাঁচ ওয়াজ্ঞ নামাযে কুরআন পাঠ করতে হয়। কারণ কুরআনে তার নির্দেশনা এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে-

فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزمل: ২০)

মাও. সাদ সাহেবের উক্তি মতে এদের কুরআন পাঠ অর্থ না বুঝে হওয়ার কারণে যদি ওয়াজিব তরকের গুনাহ হয় তাহলে তাদের নামাযের কি অবস্থা দাঁড়াবে? তাদেরতো নামাযই হবে না। মাও. সাদ সাহেব কি এ ব্যাপারে একমত হবেন?

সর্বোপরি মাও. সাদ কান্দলভীর উক্ত মন্তব্যটি দ্বারা গোটা উম্মত কুরআন তিলাওয়াত থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যবস্থা হবে। এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য দ্বীন ও ইসলামের বিকৃতি।

উল্লেখ্য, সূরা বাকারার ১২১ নং আয়াতে (يَتْلُوهُ حَقُّ تِلَاوَتِهِ) যথাযথভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ থাকায়, কেউ কেউ অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত করা আবশ্যিক বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অথচ সকল তাফসীরকারক (حق تلاوته) যথাযথ তিলাওয়াতের অর্থ করেছেন কুরআনে বর্ণিত হালালকে হালাল জানা ও হারামকে হারাম জানা, তথা কুরআনের বিধানাবলীকে মেনে চলা।

যেমন তাফসীরে ইবনে কাসিরে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে এর ব্যাখ্যা উল্লেখ আছে-

قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقراء كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، (تفسير ابن كثير: ৪০/১)

অর্থ: ইবনে মাসউদ রা. বলেন যে সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি কুরআনকে যথাযথভাবে তিলাওয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে এতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানা ও তদানুযায়ী আমল করা এবং কুরআন যেকোনো নাযিল হয়েছে সেদিকে তিলাওয়াত করা, শব্দসমূহ ও বাক্যবলীকে স্থানচ্যুত ও পরিবর্তন না করা। সুতরাং (حق تلاوته) যথাযথ তিলাওয়াত দ্বারা অর্থসহ কুরআন পড়ার ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সকল মুফাসসির ও মাযহাবের ইমাম এবং মুফতিয়ানদের বিরুদ্ধে অবস্থান। উপরন্তু এটা কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী একটি অভিমত। এমন ব্যক্তি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আদর্শ থেকে বিচ্যুত।

[ভ্রান্তি নং সাত]

আওরঙ্গাবাদের ইজতেমা (তারিখ: ২৩,২৪,২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮) এর বিবাহ মাহফিলে লাখো জনতার সামনে তিনি ওলীমা সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু আপত্তিকর কথা বলেছেন। যেমন-

ক. তিনি বলেছেন, রাসূল সা. এর ওলীমা সাদামাটা হতো। কখনো খেজুর বন্টন করে দেওয়া হতো আবার কখনো শুকনো খেজুর ছিটিয়ে দেওয়া হতো। উম্মতের ভুল হবে যদি তারা খেজুর ছিটিয়ে দেওয়াকে ওলীমা না মানে।

খ. হযরত যয়নাব রা. এর ওলীমা ছাড়া রাসূল সা. অন্য কোন স্ত্রীর ওলীমায় গোশত রুটির ব্যবস্থা করেননি।

গ. গোশত রুটি দ্বারা ওলীমা রাসূল সা. এর আমলে ছিল না; বরং তার আমলের বিপরীত ছিলো।

ঘ. যেহেতু রাসূল সা. যয়নাব রা. এর ওলীমায় তার নিজ আমল/সুন্নাত থেকে দূরে সরে গেছেন তাই এ ওলীমাতে রাসূল সা. কষ্টের শিকার হয়েছেন। গোশত রুটির ওলীমার কারণে যদি রাসূল সা. কষ্টের শিকার হয়ে থাকেন তাহলে উম্মতেরও সবক নেওয়া দরকার।

ভাষ্টির খন্ডন:

ক। মাও. সাদ সাহেব বলেছেন যে “রাসূল সা. পনীর, খেজুর দিয়ে ওলীমা করেছেন। ওলীমার মধ্যে খেজুর ছিটিয়েছেন।” অথচ খেজুর পনীর দিয়ে ওলীমা করেছেন এমন কথা সঠিক নয়। বিবাহের অনুষ্ঠানে যা করা হয় তা ওলীমা নয়। খেজুর ছিটানোর বিষয়টি বিবাহের অনুষ্ঠানে ঘটেছিল বলে একটি দুর্বল হাদীসে পাওয়া যায়। তাও ওলীমা হিসেবে নয়।

শুধু খেজুর দিয়ে রাসূল সা. ওলীমা করেছেন বলে কোন প্রমাণ হাদীস ও সীরাতে পাওয়া যায় না।। তবে বিবাহের মজলিসে খেজুর ছিটানোর প্রমাণ এক দুর্বল হাদীসে পাওয়া যায়, সেটা ওলীমা নয়।

- আল্লামা য়াফার আহমদ উসমানী রহ. বিয়ের মজলিসে খেজুর পনীর খাওয়ানোর ব্যাপারে বর্ণিত এক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-
قلت وليس ذلك بوليمة بل هو طعام التزويج ويلتحق به ما تعارفه المسلمون من نثر التمر ونحوه في مجلس النكاح (اعلاء السنن: ١٢/١١، تلخيص الحبير، لابن حجر: ٣١٤/٢)

খ। হযরত যয়নাবের বিবাহের ওলীমাতে গোশত রুটির ব্যবস্থা করেছিলেন, অন্য বিবাহে তা করেননি এটাও সঠিক নয়।

- হযরত আনাস রা. বলেন-

ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة (صحيح البخاري: رقم الحديث: ٤٨٧٦)

- হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসের ব্যাপারে ইবনে হাজার রহ. বলেন-

ونفى أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها محمول على ما انتهى إليه علمه أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشيع المسلمين خبرا ولحما من الشاة الواحدة (فتح الباري: ٢٣٨/٩)

অর্থাৎ হযরত যয়নাব রা. ছাড়া অন্যদের ওলীমাতে এমন কিছু ঘটেনি বলে আনাস রা. যে মন্তব্য করেছেন সেটা তার জ্ঞান অনুপাতে, অথবা (তিনি বুঝতে চেয়েছেন) যয়নাবের এই ওলীমাতে প্রচুর বরকত হয়েছে, এক বকরি দিয়ে অনেক লোক খেতে পেরেছেন, রুটির পরিমাণও পর্যাপ্ত ছিল, এ ধরনের বরকত অন্য ওলীমাতে হয়নি। (ফাতহুল বারী: ৯/২৩৮)
এটাই হাদীসের মর্মার্থ। নচেৎ অন্যান্য বর্ণনায় আছে রাসূল সা. হযরত মায়মুনার বিবাহে একাধিক বকরী জবাই করে ওলীমার ব্যবস্থা করেছেন।

- ইবনে হাজার রহ. বলেন-

والا فالذي يظهر أنه لما أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة (فتح الباري: ٢٣٨/٩)

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে, রাসূল সা. যখন ওমরাতুল কাজার সময় মক্কাতে মাইমুনা বিনতে হারিসকে বিবাহ করেন, তখন সেই ওলীমাতে রাসূল সা. মক্কার লোকদেরও দাওয়াত করেছিলেন, যদিও তারা (অনেকে) আসেনি। উক্ত ওলীমাতে রাসূল সা. এর পর্যাপ্ত সামর্থ্য থাকায় একাধিক বকরী দিয়ে ওলীমার ইত্তেজাম করা হয়েছিল। (ফাতহুল বারী: ৯/১২০)

বুঝা গেল ‘শুধু যয়নাব রা. এর বিবাহে গোশত ও রুটির ব্যবস্থা করেছেন অন্য কোথাও করেননি’ মাও. সাদ সাহেবের এ বক্তব্য অবাস্তব।

গ। গোশত রুটি দিয়ে ওলীমা করা রাসূল সা. এর কুওলী সুন্নাত।

- আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা.কে আদেশ করে বলেছেন-

عن حميد سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع ... فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة (صحيح البخاري: رقم الحديث: ٥١٦٧)

অর্থাৎ, একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলীমা কর।

এটা রাসূলের বাণী। ওলীমা সংক্রান্ত উক্ত বাণীর দ্বারা প্রমাণিত হলো সামর্থ্য থাকলে ওলীমাতে গোশতের ব্যবস্থা করা রাসূল সা. এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল সা. যয়নাব রা. এর ওলীমাতে গোশতের ব্যবস্থা করার দ্বারা নিজ আমল/সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলেন এমন মন্তব্য করা (তাও আবার ভিত্তিহীন বর্ণনা দিয়ে) শরীয়তের বিকৃতিসাধন এবং রাসূল সা. এর শানে চরম বেয়াদবী। অথচ হাদীসে এসেছে এই ওলীমাতে আল্লাহ পাক প্রচুর বরকত দিয়েছেন। গোশত দিয়ে ওলীমা করা যদি সুন্নাত পরিপন্থী হয় তবে আল্লাহ তাতে এত বরকত দিলেন কেন?

- সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও গোশত রুটি দিয়ে ওলীমার সুনাত পালন করার প্রচলন ছিল। স্বয়ং হযরত ফাতেমা রা. এর বিবাহে হযরত আলী রা. এর পক্ষ থেকে দুম্বা জবেহ করে ওলীমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

عن ابن بريدة عن أبيه ... فلما كان بعد ذلك بعدما زوجه قال : يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة قال سعد : عندي كبش وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة (المعجم الكبير للطبراني: رقم الحديث: ١١٥٣)

ঘ। সবচাইতে মারাত্মক কথা হচ্ছে, রাসূল সা. এই ওলীমাতে গোশত ও রুটি পেশ করার কারণে সুনাত/নিয়ম থেকে বিচ্যুত হওয়ায় রাসূল সা. কে কষ্টের/পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। نعوذ بالله
এই উক্তিটি রাসূলের মর্যাদায় চরম আঘাত। যায়নাব রা. এর সাথে রাসূল সা. এর বিয়েতে আল্লাহর বিশেষ রহস্য ছিল এবং শরীয়তের মহত উসূল ও বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই বিবাহটি স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছে। এমন তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টিকে মাও. সাদ সাহেব কিভাবে রাসূল সা. এর কষ্টের কারণ বলে দিলেন তা বোধগম্য নয়।

[ভ্রান্তি নং আট]

“প্রাদেশিক দায়িত্বশীল যারা নিজেদের প্রদেশের প্রতিনিধি হয়ে প্রতি তিন মাস অন্তর পথনির্দেশনা জানতে আসেন তাদের মাজলিসে মাওলানা সাদ সাহেব কুরআনের এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (النساء: ৬৭)

উক্ত আয়াতে চার শ্রেণীর মানুষ যাদের উপর আল্লাহ নেয়ামত দান করেন, তাঁদের মধ্যে মেহনতকারীদের সংখ্যাই বেশী। (তাঁরা হলেন) নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণ। এক প্রকার হল সালেহীনের। তিন প্রকার মেহনতকারীদের। এক প্রকার কারামতওয়ালাদের। তাদের মধ্যে নুসরত সাহায্যপ্রাপ্ত হবে তারা, যারা দাওয়াতের উপর অবিচল। সাহাবাদেরকে গায়েবী নুসরাত-সাহায্য করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে দাওয়াতের শর্তে। (অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ দ্বীনের রাস্তায় সাহায্য করলে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন।) সুফীগণ শুধু দ্বীনের পথিক দ্বীনদার, তারা দ্বীনের সাহায্যকারী নয়। তাদের সাধনায় কারামত প্রকাশ পাবে কিন্তু (গায়েবী) নুসরত আসবে না। গায়েবী নুসরতের মূল কারণ হল এমন দাওয়াত যা (অন্যের কাছে) নিজে গিয়ে দেওয়া হয়। নিজে গিয়ে প্রদত্ত দাওয়াতকেই দাওয়াত বলা হয়। কোন মাধ্যমে বার্তা পৌঁছানো দাওয়াত নয়।” (১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ বাদ ফজর প্রদত্ত বয়ান)

ভ্রান্তির খন্ডন:

মাওলানা সাদ সাহেব এ বক্তব্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী নুসরত প্রাপ্তির জন্য দাওয়াতকে শর্ত আখ্যা দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি দাওয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তা সংকুচিত করেছেন “দাওয়াত হল নিজে গিয়ে পৌঁছে দেয়া।”

আয়াতে বর্ণিত নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীন, এ চার শ্রেণীকে মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভাগ করে বলে দিলেন, “সুফীগণের কাছে গায়েবী নুসরত আসবে না।” অথচ কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা হেদায়াত প্রাপ্তদের হেদায়াত বৃদ্ধি ও তাকওয়া দানের ঘোষণা দিয়েছেন।

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (محمد: ১৭)

অর্থ: যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সৎপথপ্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন। (সূরা মুহাম্মদ: ১৭)
বলুনতো, হেদায়াতের উপর অবিচল থাকতে পারা এবং তাকওয়া অর্জন করতে পারা কি আল্লাহর নুসরত নয়? অবশ্যই নুসরত। অধিকন্তু মাওলানা সাদ সাহেব কারামত ও নুসরতকে আলাদা করে দেখানো এবং সুফীগণকে দ্বীনের পথিক, সাহায্যকারী নয় বলে আখ্যায়িত করাটা ভিত্তিহীন ও শরীয়তের বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুফীগণের কারামত আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরতের অংশ। সুতরাং তাঁর প্রদত্ত নুসরতের মর্ম অবশ্যই জমহুর আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের মতের পরিপন্থী এবং তার ভুল চিন্তাধারার ফসল।

- হযরত সুলাইমান আ. বিলকিস রাণীর নিকট বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন।
- রাসূল সা. পত্র প্রেরণের মাধ্যমে শাহে কিসরা, রুমের শাহে কায়সার, শাহে হাবশা নাজ্জাশী, কিবতী, সম্রাট মুকাওকিস, বাহরাইনের অধিপতি মুনযির এবং ইয়ামেনের প্রধান হুজা বিন আলী, দামেশকের গভর্নর হারিস গাসসানীর প্রতি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। রাসূল স্বশরীরে উপস্থিত হননি। খোলাফায়ে রাশেদীনও এ আমল করেছেন। কুরআন-হাদীস তাফসী ও সীরাতের কিতাবে এর উদাহরণের অভাব নেই। তাহলে এসব কি দাওয়াত নয়? তাই মাও. সাদ সাহেবের দাওয়াতের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী ও ইসলামের বিকৃতি।

[ভ্রান্তি নং নয়]

মাও. সাদ সাহেব বলেন- “আজ আমি আমার রুটিন ভেঙে এ জন্য এ কিতাব পড়ছি যে, বিষয়টি নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম ফেতনায় পড়ে গিয়েছিলেন। কেননা এ যুগে ইসলাম ত্যাগ করাকে ইরতিদাদ বা মুরতাদ হয়ে যাওয়া মনে করা হয়। মনযোগ দিয়ে সবাই শোন, ধর্ম ত্যাগ করাকে এ যুগে ইরতিদাদ মনে করা হয়, অথচ সাহাবা যুগে তাঁরা মদীনা শরীফ থেকে নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করাকে ইরতিদাদ মনে করতেন। তোমরা আসলে পড়ো না। নিয়ামুদ্দিনে আসতে অস্বীকৃতি জানানো সাধারণ ব্যাপার নয়।” [রুজুকে বা’আদ কিয়ে গ্যায়ে বা’আয বয়ানাত কা ইলমী জায়েযা: ১২,১৩]

ভ্রান্তির খন্ডন:

উপর্যুক্ত উক্তিটি হাদীসের অপব্যাক্ত্যা এবং তার অর্থ বিকৃতি।

তাঁর এ বক্তব্যের মূলে ছিল হায়াতুস সাহাবার এ হাদীস, যাতে বর্ণিত আছে-

عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: أصاب أسلم وجع فقال رسول الله ﷺ: يا أسلم ابدوا، قالوا: يا رسول الله! نكره أن نرتد ونرجع على أعقابنا.
(كنز العمال: رقم الحديث: ৩৮০. ১৮)

এ বর্ণনার মাঝে তিনি نرتد শব্দের অর্থ করেছেন “মুরতাদ হওয়া” এই ভুল অর্থ দ্বারা একটি নব্য বেদআত আবিষ্কার করেছেন, সাহাবাগণ মদীনা থেকে নিজ এলাকায় যাওয়াকে ইরতিদাদ মনে করতেন। তাই নিয়ামুদ্দিন থেকে ফিরে চলে গেলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ! এই হাদীসে نرتد এর অর্থ হচ্ছে দেশে ফিরে যাওয়া।

তিনি এ বর্ণনায় نرتد “ফিরে যাওয়ার” অর্থকে বদলে দিয়ে “মুরতাদ হওয়া” বানিয়েছেন। ঠিক একই ধরনের কথা মাওলানা মওদুদী সাহেব থেকে উচ্চারিত হয়েছিল; “এটা এমন পথ নয় যেখানে অগ্রসর হওয়া বা পেছনে যাওয়া দুটোই সমান। এখানে পেছনে সরে যাওয়ার মানে হল ইরতিদাদ বা মুরতাদ হয়ে যাওয়া।” উক্ত বর্ণনায় نرتد ونرجع শব্দের অর্থ বিকৃতি-ই মারাত্মক ভ্রান্ত উক্তির ভিত্তি।

উপর্যুক্ত বক্তব্যে প্রদত্ত ব্যাক্ত্যা শুধু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতের পরিপন্থীই নয়; বরং এটা তার ইলমী দৈন্যদশারও বহিঃপ্রকাশ। উপরন্তু তিনি নিয়ামুদ্দীনের মারকাযকে মদীনা শরীফের সাথে তুলনা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন যা শরীয়তের চরম সীমালঙ্ঘন।

অনেক সাহাবীর ইতিহাসে পাওয়া যায়, যারা ইসলাম গ্রহণের পর নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়েছেন। সীরাত বিষয়ক কিতাবের পাতা উল্টালে এর অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহলে তারা নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছেন? استغفر الله

- ১। নবম হিজরীতে বনু সাকিফার প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে। তারা ইসলাম গ্রহণের পর নিজ গোত্রে ফিরে যায়।
- ২। ষাট সদস্য বিশিষ্ট নাজরানের প্রতিনিধি দলটি নবম হিজরীতে মদীনায় আসে এবং রাসূল সা. এর সাথে দীর্ঘ আলাপচারিতার পর ইসলাম গ্রহণ করে নিজ কাওমে প্রত্যাবর্তন করে।
- ৩। দশ হিজরীর শা’বান মাসে ইয়ামানের খাওলান সম্প্রদায়ের লোকেরা মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণের পর নিজ জাতির নিকট ফিরে যায়। ফিরে যাবার প্রাক্কালে রাসূল সা. তাদেরকে চার উকিয়া চাঁদি পাথেয় হিসেবে প্রদান করেন।
- ৪। মুহারিব গোত্রের দশ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল দশম হিজরীতে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে স্বগোত্রে প্রত্যাগমণ করেন।
- ৫। সুদা প্রতিনিধি দলের আগমনের ঘটনাটি অষ্টম হিজরীর পরের কথা। সুদায়ী গোত্রের দলপতির নাম যিয়াদ বিন হারেস। তিনি পনের সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে যান এবং বিদায় হজ্জের সময় এ গোত্রের একশ জন লোক আরাফাতের ময়দানে সমবেত হয়েছিলেন।
- ৬। দশম হিজরীতে ইয়ামানের গামেদ গোত্রের দশ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এসে ইলাম গ্রহণ করে। প্রত্যাবর্তনকালে রাসূল সা. তাদেরকে শরীয়তের লিখিত বিধানাবলী এবং উপহার সামগ্রী দিয়ে বিদায় করেন।
- ৭। বনু আযদ এবং বনু মুস্তালিকের প্রতিনিধি দল মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করে ফিরে যায়। [এগুলো আল্লামা ইদরিস কান্দলভী রহ. কর্তৃক রচিত সীরাতে মুস্তফার ৩য় খন্ডের বিবরণ।]

[ভ্রান্তি নং দশ]

মাও. সাদ কান্দলভী বলেন- আসবাবের সাহায্য নেয়া অবৈধ কাজ:

ক. হযরত ইবরাহীম আ. যেভাবে মূর্তিকে অস্বীকার করেছেন যদি সেভাবে সকল আসবাব উপকরণকে অস্বীকার না করা হয় নতুন পুরাতন যত আসবাব আছে, মাখলুকের হাতে তৈরি বা সরাসরি আল্লাহ পাকের তৈরি যত আসবাব উপকরণ আছে

সবগুলোকে যদি সমানভাবে অস্বীকার না করা হয় তাহলে আল্লাহর কসম! ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। সাদ সাহেবের বয়ান সমগ্র: কালিমা কি দাওয়াত এর সূত্র: আসবাব কি মুতাআল্লাক ইলমী তাহকীক: ৩

খ. নবীগণ উম্মতকে আসবাবের রাস্তায় রেখে যাননি। [সাদ সাহেবের বয়ান সমগ্র: ৩ এর সূত্র: আসবাব কি মুতাআল্লাক ইলমী তাহকীক: ৩]

গ. আমার আশ্চর্য হয় যখন আমাদের সাথী বলে, দুনিয়া দারুল আসবাব, এ জন্যে দোকান, ব্যবসা বা কৃষিকর্মের প্রয়োজন আছে। এটা কক্ষণো নয়। [আসবাব কি মুতাআল্লাক ইলমী তাহকীক: ১৩]

ঘ. এটা ভুল ধারণা, আমরা আসবাব উপকরণ অবলম্বন করবো, অতঃপর আল্লাহ তাআলা সফলতা দান করবেন। [আসবাব কি মুতাআল্লাক ইলমী তাহকীক: ১৪]

ঙ. লোকেরা বলে, প্রথমে আসবাব অবলম্বন কর এরপর আল্লাহর কাছে দুআ কর। এটা উল্টা কথা, কুরআন হাদীসেরও খেলাফ। [আসবাব কি মুতাআল্লাক ইলমী তাহকীক: ১৪]

ভ্রান্তির খন্ডন

এ জাতীয় সকল কথাবর্তা কুরআন-হাদীস, নবীগণের সীরাতে, সাহাবায়ে কেরামের তরীকা ও জমহুর উম্মতের মতাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ সংক্রান্ত কুরআন-হাদীসের কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হল:

ক। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা নেক বান্দাদের প্রশংসা করেছেন, তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তবে ব্যবসা বাণিজ্য তাদেরকে আল্লাহর যিকির ও ইবাদত থেকে গাফেল করে না।

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (سورة النور: ৩৭)

খ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ: হে মুমিনগণ! জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরান্বিত হও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তাল্লাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমআ: ৯, ১০)

গ। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে-

عن أنس بن مالك يقول قال رسول الله اعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال اعقلها وتوكل (سنن الترمذی: ২০১৭)

হযরত আনাস বিন মালেক রা. বলেন, জৈনিক ব্যক্তি রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করল, আমি উটনী বেধে রেখে তাওয়াক্কুল করব, নাকি না বেধে? রাসূল সা. বললেন, বেধে রাখো! এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। (জামে তিরমিযী: ২৫১৭)

ঘ। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে-

عن ابن عباس ؓ قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأُنزل الله تعالى {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} (صحيح البخارى: رقم الحديث: ১০২৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- ইয়ামনের কিছু লোক মাল ও আসবাব ছাড়া হজ্জ করতে আসে এবং বলে, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি। কিন্তু তারা যখন মক্কায় গিয়ে পৌছলো তখন মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে শুরু করল। এ প্রেক্ষিতে সূরা বাকারায় ১৯৭ নং আয়াতটি নাযিল হয়। যার অর্থ “আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়।” (সহীহ বুখারী: ১৫২৩)

ঙ। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সহীহ বুখারীর হাদীস **ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء** এর অধিনে লিখেছেন-

وفيهما كلها إثبات الأسباب وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله

অর্থ “এ সকল রেওয়াজের দ্বারা আসবাবের তাল্লাশ প্রমাণিত হয় এবং এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, আসবাব গ্রহণ করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। (ফাতহুল বারী: ১০/১৬৭)

চ। রাসূল সা. নিজে মজদুরী করে অর্থ উপার্জন করেছেন। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عن أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرها على قراريط لأهل مكة (صحيح البخارى: رقم الحديث: ২২৬২)

ছ। হযরত দাউদ আ. নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عن المقدم ﷺ عن رسول الله ﷺ قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده (صحيح البخارى: ٢٠٧٢)

জ। হযরত আবু বকর রা., উসমান রা., তালহা রা., আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. প্রমুখ সাহাবীগণ ব্যবসা করতেন। যেমন: আল্লামা বুজাইরমী বলেন-

وذكر صاحب كتاب بصائر القدماء وسرائر الحكماء ... كان أبو بكر الصديق بزازا وكذلك عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف ، وكان عمر دلالا يسعى بين البائع والمشتري ، وكان الوليد بن المغيرة حدادا وكذلك أبو العاص أخو أبي جهل ، وكان عبد الله بن جدعان نخاسا يبيع الجواري ، وكان النضر بن الحارث عوادا يضرب بالعود ، وكان الحكم بن العاص خصاء يخصي الغنم ، وكان العاص بن وائل السهبي يطارا يعالج الخيل ، وكان ابنه عمرو بن العاص جزارا . (حاشية البجيرمي على الخطيب: ٢٠٠/١٣)

ঝ। একবার সাহাবায়ে কেলাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি ঔষধ গ্রহণ করব? রাসূল সা. ইরশাদ করলেন হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ঔষধ গ্রহণ করো। সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত আছে-

عن أسامة بن شريك قال : (قالت الاعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال نعم يا عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء .(سنن الترمذی: ٢١٠٩)

ট। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: " طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة "

রাসূল সা. ইরশাদ করেন- হালাল উপার্জন করাও ফরজ। (আসুনানুল কুবরা, বায়হাকী: হা. ১১৬৯৫)

[ভ্রান্তি নং এগার]

মাও. সাদ সাহেব বলেন- “আল্লাহর রাস্তায় এক বৎসরের খুরুজ ছুটে যাওয়াও অপরাধ। এ অপরাধের কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। কেননা, কা’ব ইবনে মালিক রা. এর ব্যাপারে যে আসমানী তিরস্কার নাথিল হয়েছিলো, সকল বামেলো শুধু এ কারণে হয়েছিলো, যদিও সব সময় আল্লাহর রাস্তায় বের হতেন, কিন্তু শুধু ঐ একবার বের হতে পারেননি। একবারের খুরুজ ছুটে যাওয়ার কারণে তার ব্যাপারে ধমকি নাথিল হয়েছে।” [মাও. সাআদ সাহেব সে উলামায়ে উম্মত কী ইখতিলাফ কী বুনিয়াদী ওজুহাত: ১৭]

ভ্রান্তির খন্ডন

এই বক্তব্য সংশ্লিষ্ট আয়াত ও ঘটনার সম্পূর্ণ অপপ্রয়োগ। কা’ব ইবনে মালিকের তিরস্কৃত হওয়ার কারণ ছিলো, ফরয জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা। প্রচলিত দাওয়াতে তাবলীগের খুরুজের সঙ্গে উক্ত ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। ফরয জিহাদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত আয়াত ও তিরস্কারকে তাবলীগ জামাতের খুরুজের জন্য প্রয়োগ করা আয়াতের বিকৃতি ও অপব্যাক্তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ বিষয়টির উপর আমরা উপরেও আলোকপাত করেছি।

[ভ্রান্তি নং বার]

মাও. সাদ কান্দলভী সাহেব বলেন- “আযান হলো দাওয়াত, নামায হলো তাশকীল (গঠন)। আর নামাযের পর আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া তারতীব” (কর্মবিন্যাস)। [মাও. সাআদ সাহেব সে উলামায়ে উম্মত কী ইখতিলাফ কী বুনিয়াদী ওজুহাত: ১৫]

ভ্রান্তির খন্ডন

এ কথার মর্ম হলো, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াটাই আসল কাজ। আযান ও নামায হলো সে কাজের প্রস্তুতি মাত্র। একই কথা মওদুদী সাহেবও বলেছেন, নামায, রোযা, যাকাত ও সব আহকাম একটি আসল কাজের প্রস্তুতি ও অনুশীলনের জন্যে। আসল কাজ হলো اقامت دين অর্থাৎ হুকুমতে ইলাহিয়া কায়েম করা। অর্থাৎ এখানে মাধ্যমকে উদ্দেশ্য (مقصود) ও উদ্দেশ্যকে মাধ্যম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাই উপর্যুক্ত বক্তব্য দ্বীনের আমূল বিকৃতি। কেননা, নামায দ্বীনের খুঁটি। ইসলামের পঞ্চস্তরের অন্যতম। এটি মৌলিক ইবাদত। অথচ এই নামাযকে তিনি প্রস্তুতি ও মাধ্যম পর্যায়ে ইবাদত সাব্যস্ত করেছেন। এ ধরনের দ্বীন বিকৃতির কারণে ইসলামী ইতিহাসে অনেক ভ্রান্ত দলের জন্ম হয়েছে।

[ভ্রান্তি নং তের]

মাও. সাদ কান্দলভী সাহেব বলেন- “এই স্থানের সম্মান করো। সমগ্র পৃথিবীর অবস্থা হলো, মক্কা-মদীনার পর যদি কোন জায়গা সম্মানিত, অনুসরণ যোগ্য, আনুগত্যের উপযুক্ত ও মহত্বের উপযুক্ত থাকে, তাহলে সেটি হলো নিযামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদ।” [মাও. সাআদ সাহেব সে উলামায়ে উম্মত কী ইখতিলাফ কী বুনিয়াদী ওজুহাত: ১৭]

ভ্রান্তির খন্ডন

এই বক্তব্য দলীল-প্রমাণহীন, মনগড়া ও সীমালঙ্ঘন। হাদীস শরীফে ধারাবাহিকভাবে শুধু তিন মসজিদের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা। হাদীসে এসেছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ﷺ ومسجد الأقصى (صحيح البخاري: رقم الحديث: ১১৭৭)

তিনি মসজিদে আকসাকে বাদ দিয়ে তৃতীয় স্থানে নিযামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদকে দাবী করলেন।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর প্রথম কেবলা বাইতুল মাকদিসের চেয়েও বাংলাওয়ালী মসজিদের ফযিলত বেশী, এটা শুধু হাস্যকরই নয়, রীতিমত অবাক করে দেয়ার মত উক্তি। আজ পর্যন্ত কোন আহলে ইলম এ দাবী করেননি যে, বাইতুল মাকদিসের চেয়েও তার মসজিদের গুরুত্ব বেশী। কুবার মসজিদের ব্যাপারে ওহী নাযিল হয়েছে المسجد أسس على التقوى আল্লাহ তাআলা যে মসজিদকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ঘোষণা দিয়েছেন তার চেয়েও কি বাংলাওয়ালী মসজিদের গুরুত্ব অধিক? মুসলমানরা বিশ্বাস করে, আখেরী যামানায় হযরত ঈসা আ. আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। তিনি যে মসজিদে অবতরণ করবেন, সে মসজিদের চেয়েও কি নিযামুদ্দিনের কদর বেশী?

[ভ্রান্তি নং চৌদ্দ]

ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল ব্যবহার করা হারাম।

মাও. সাদ কান্দলভী বলেন- “ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল রাখা হারাম এবং পকেটে মোবাইল রেখে নামায হয় না। যে আলেমগণ ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল রাখাকে জায়েয বলেন তারা উলামায়ে ‘সূ’ তারা উলামায়ে ‘সূ’। এমন আলেমরা হলো গাধা, গাধা। তোমরা উলামায়ে কেরাম থেকে যত ইচ্ছা ফতোয়া নাও। ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল থেকে কুরআন শ্রবণ করা ও পড়া কুরআনের অবমাননা করা। এতে গোনাহ হবে, কোন সাওয়াব হবে না। এর কারণে আল্লাহ তাআলা কুরআনের উপর আমল করা থেকে মাহরুম করে দিবেন।” [মাও. সাআদ সাহেব সে উলামায়ে উম্মত কী ইখতিলাফ কী বুনয়াদী ওজুহাত: ১২, হযরতজী মাও. মুহাম্মদ সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ইতিরাযাত কা মুনসিফানা জায়েযাহ: ৪৪, হযরত মাও. সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ইতিরাযাত কী তাহকীক: ১০, সাআদত নামা: ৬, তিনি ৭ ডিসেম্বর ২০১৬ ইং ভূপালের ইজতিমায় এ উক্তি করেন।]

ভ্রান্তির খণ্ডন

এটি একটি মনগড়া ফতোয়া, যার পক্ষে কোন খোঁড়া দলীলও নেই। ফিক্হ-ফতোয়ার কিতাবাদী ও বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের সিদ্ধান্তমূলক ফতোয়ার বিপরীতে মাও. সাদ সাহেবের মনগড়া ফতোয়াটি তিনি میرے نزدیک (আমার মতে) বলে চালিয়ে দিলেন সঙ্গে মোবাইল থেকে কুরআন শুনলে বা পড়লে গোনাহ হওয়া এবং কুরআনের উপর আমল থেকে বঞ্চিত হওয়ার ধমকিও দিলেন।

প্রথম কথা:

- হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. নব আবিষ্কৃত বস্তু ব্যবহারের উসূল বয়ান করেছেন- ‘ইসলামে কোন প্রকার গোড়ামির স্থান নেই। যে জিনিস অমুসলিমদের কাছে রয়েছে (তাদের আবিষ্কৃত) এবং এর অনুরূপ জিনিস মুসলমানদের কাছে নেই সে জিনিসটি যদি অমুসলিমদের ধর্মীয় কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়, তাহলে এমন জিনিস ব্যবহার করা জায়েয। ইউরোপের নব-আবিষ্কৃত বস্তু ব্যবহারে কোন বাধা নেই। কিন্তু সীমা অতিক্রম করা যাবে না। (ওয়ালীল হুদুদুল কুযুদ: ৫/৪৪)
- আল্লামা মুফতি শফী রহ. লিখেছেন- আবিষ্কৃত বস্তু চাই পুরাতন হোক বা সাম্প্রতিককালের হোক, যা মানুষের জীবন ধারণের জন্য কল্যাণকর হয় তা সবই আল্লাহর নেয়ামত, তার সকল নিয়ামত থেকে উপকৃত হওয়া যাবে। কিন্তু দুটি শর্ত সাপেক্ষে-
১। এই নিয়ামতকে গোনাহ ও নাফরমানীর কাজে ব্যবহার না করা।
২। নিয়ামতদাতাকে ভুলে না যাওয়া। (জাওয়াহিরুল ফিক্হ: ৭/২৯৪)

উক্ত মূলনীতির আলোকে মোবাইল বৈধ কাজে ব্যবহার করা জায়েয।

দ্বিতীয় কথা:

খুলাসাতুল ফাতাওয়া, আল-বাহরর রায়েক, ফতোয়ায়ে শামীসহ বহু কিতাবেই এই ফতোয়া স্পষ্টভাবে দেয়া আছে যে- “কোন ব্যক্তি যদি প্রাণীর ছবি বিশিষ্ট জামার উপর অন্য কোন চাদর, কাপড় বা অন্য জামা দ্বারা ছবিটি এমনভাবে ঢেকে নেয়, যার দ্বারা ছবিটি দৃশ্যমান থাকে না, এ অবস্থায় নামায আদায় করলে তার নামায সহীহ হবে, মাকরুহ হবে না।”

আরো উল্লেখ আছে “যার পকেট এবং থলের মধ্যে এমন টাকা-পয়সা, দিনার, দিরহাম বা কোন কাগজ আছে যার মধ্যে প্রাণীর ছবি রয়েছে এগুলো পকেটে থাকার কারণে ঢেকে থাকে, দৃশ্যমান হয় না। তাহলে এমতাবস্থায় তার নামায পরিশুদ্ধ হবে। (আল-বাহরুর রায়েক: ২/১৯-২৭)

ফুকাহায়ে কেরামের এ জাতীয় ফতোয়ার আলোকে বর্তমান ফকীহগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ক্যামেরা ওয়ালা মোবাইল পকেটে রেখে নামায পড়া বিশুদ্ধ, মাকরুহ হবে না।

তৃতীয় কথা:

- আল্লামা মুফতি শফী রহ. কে রেডিওর তিলাওয়াত শ্রবণ করা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন “যে যন্ত্রে তিলাওয়াত জায়েয সেই যন্ত্রের মধ্যে কুরআন শ্রবণও জায়েয।” (উল্লেখ্য, তিনি কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত করাকেও জায়েয বলেছেন।) (আলাতে জাদীদাহ কি শরয়ী আহকাম [জাওয়াহিরুল ফিকহ]: ৭/৪৫০)
- আলোচ্য বিষয়ে শাহী মুরাদাবাদের মুফতি শাব্বির সাহেব ও মুফতি সালামান মানসুরপুরী কর্তৃক ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। তারা বলেন- “মোবাইলের মাধ্যমে দ্বীনি ওয়াজ নসীহত, হামদ, নাত ইত্যাদি শ্রবণ করা জায়েয। (মুসতাফায়ে ইমদাদুল ফতোয়া: ৪/২৪৯)
তারা আরো বলেন- “মোবাইলের স্ক্রীনে আল্লাহর নাম, রাসূলদের নাম বা কুরআনের আয়াত ইত্যাদি লিখে রাখা জায়েয, কিন্তু এগুলো ওপেন থাকা অবস্থায় মোবাইল নিয়ে বাথরুমে যাওয়া জায়েয নেই।” (কিতাবুন নাওয়াযিল: ১৭/৯০)
সুতরাং প্রমাণ হলো যে, মোবাইলে কুরআন পড়া যাবে না, গোনাহ হবে মর্মে মাও. সাদ যা কিছু উক্তি করলেন তা সম্পূর্ণ ভুল ও তার মনগড়া ফতোয়া। যেটা সমকালীন বিজ্ঞ ফকীহদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।

চতুর্থ কথা:

মাও. সাদ কান্দলভী সকল উলামা ও মুফতিয়াবে কেরাম যারা মোবাইল ব্যবহার এবং মোবাইল রেখে নামায পড়াকে জায়েয বলেন তাদেরকে উলামায়ে “সূ” “গাধা” ইত্যাদি বলে গালি দিলেন। প্রশ্ন হলো, নিজের ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে কারো ফতোয়ার মিল না হলেই তাকে গালমন্দ করা কোন বৈধতার আওতায় পড়ে? এটা কোন মুমিনের চরিত্র হতে পারে না; বরং এটা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। হাদীসে আছে-

عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (صحيح البخاري: رقم الحديث: ৬০৬৬)

রাসূল সা. বলেছেন- মুসলমানকে গালী দেয়া ফাসেকী আর হত্যা করা কুফরী।

উল্লেখ্য, উলামায়ে “সূ” এর অর্থ হচ্ছে যারা সত্যকে গোপন করে, শরীয়তের স্পষ্ট বিধানকে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে এবং প্রকাশ্যে কবিরাহ গোনাহে লিপ্ত থাকে। এদেরকে ফাসিকও বলা হয়। তাহলে চিন্তা করুন মাও. সাদ সাহেব যাদেরকে উলামায়ে “সূ” বললেন তারা সবাই আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ, ফুকাহায়ে কিরাম যাদের মর্যাদার কথা কুরআন ও হাদীসে ভরপুর।

[ভ্রান্তি নং পনের]

মাও. সাদ সাহেব বলেন, “হেদায়াত পাওয়ার জায়গা মসজিদ, অন্য কোথাও না। দ্বীনের যেসব জায়গায় শুধু দ্বীন পড়ানো হয় সেগুলোর সম্পর্কও যদি মসজিদের সাথে না হয় তাহলে খোদার কসম সেখানেও দ্বীন হবে না। হ্যাঁ, দ্বীনের শিক্ষা হবে, দ্বীন হবে না।”

(এই উদ্ধৃতিতে “মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক” দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়া নয়। কেননা, এ কথা তিনি মসজিদের গুরুত্ব ও দ্বীনের কথা লোকদেরকে মসজিদে এনেই বলতে হবে মর্মে এই বিশেষ মতাদর্শ বর্ণনা করার সময় উক্তিটি করেছেন। পূর্ণ কথা অডিওতে বিদ্যমান আছে। তার মতাদর্শ হল দ্বীনের কথা মসজিদের বাইরে বলা সুন্নাতের খেলাফ। নবীজী সা. ও সাহাবাদের তরীকার পরিপন্থী।) দারুল উলুম দেওবন্দের ফাতাওয়াহ।

ভ্রান্তির খন্ডন

এ বক্তব্য সুস্পষ্ট শরীয়ত বিরোধী এবং অসংখ্য হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত এবং সীরাতের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ হযরত খাদীজা রা., হযরত আবু বকর রা. ও হযরত উমর রা. প্রমুখ বড় বড় সাহাবাগণ মসজিদের বাইরে হেদায়াত পেয়েছেন। তাছাড়া রাসূল সা. সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন মসজিদের বাইরে সাফা পাহাড়ে উঠে। রাসূল সা. বিভিন্ন গোত্রের নিকট দাওয়াত দিয়েছেন। ওকাযের মেলায় দাওয়াত দিয়েছেন। হজ্বের সময় মিনায় গিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন এবং বাইআতুল আকাবাহ

সংঘটিত হয়েছে। তায়েফের সর্দারদের বাড়ি গিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন। এগুলো একটাও মসজিদের ভিতরে ছিলো না। হাদীস ও সীরাতে গ্রন্থসমূহ এ ধরনের ঘটনায় ভরপুর।

[ভ্রান্তি নং ষোল]

মাও. সা'দ কান্দলভী সাহেব বলেন- “খুরুজ এবং নফর ব্যতীত সাহাবীদের যামানায় দাওয়াতের কোন কল্পনাও ছিল না। এ যামানায় মুসলমান খুরুজ এবং নফর ব্যতীত দাওয়াতের কল্পনা করতে শুরু করেছে; বরং দাওয়াতকে খুরুজ ব্যতীত ‘দাওয়াত’ বুঝতে শুরু করেছে। একশতে একশ সব সাহাবা নকল ও হরকতের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। কোন একজন সাহাবীও খুরুজের বাইরে ছিলেন না।” (মাও. সাদ সাহেব সে উলামায়ে উম্মত কী ইখতিলাফ কী বুনিয়াদী ওজুহাত: পৃ.১৬)

ভ্রান্তির খন্ডন

খুরুজ এবং নফর দু'টি আলাদা বিষয়। যারা শরীয়তের মাসআলা জানার জন্য বের হয়েছে, যারা নামায পড়ার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, যারা ইলম তলব করার জন্য বের হয়েছে, যারা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য বের হয়েছে, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তারা সকলেই সাবিলুল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে। আর নফর হলো জিহাদ, যা ফরযে কেফায়া। ক্ষেত্রবিশেষে তা ফরযে আইনও হয়। ফকীহগণ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় তখন গোলামেরও দায়িত্ব হলো মনিবকে জিজ্ঞেস না করেই বেরিয়ে পড়া। একেই ‘নফীরে আম’ বলে। দাওয়াতের জন্য বের হওয়ার ক্ষেত্রে নফর বলা হয় না। মাও. সাদ সাহেব তাবলীগে বের হওয়ার জন্য নফরের প্রসঙ্গ টেনে انفروا خفافا আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এ আয়াতের মধ্যে নফীরে আমের নির্দেশ কে তাবলীগের খুরুজ মনে করা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ও কুরআনের অর্থগত বিকৃতি। এ ধরনের আয়াতগুলো কিতালের বিশেষ সুরতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোকে তাবলীগের উপর প্রয়োগ করা এবং যারা বের হবে না তাদের তিরস্কার করা ও ধিক্কার দেয়া দাওয়াতের জন্য খুরুজকে শর্তযুক্ত করা করা সীমালঙ্ঘন, তদুপরী কুরআনের অপব্যাখ্যা।

খুরুজ বা তাবলীগ ছাড়া আর কোন দাওয়াতের মাধ্যম নেই এমন উদ্ভট চিন্তা বিকারগ্রন্থ মস্তিষ্কের ফসল।

[ভ্রান্তি নং সতের]

মাও. সাদ সাহেব বলেন, “তাওবা কবুলের তিনটি শর্ত মানুষ জানে। কিন্তু চতুর্থ শর্ত আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, মানুষ তা ভুলে গেছে।” [হযরতজী মাও. মুহাম্মদ সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালাই ইতিরাযাত কা মুনসিফানা জায়েযাহ: ৪৭, হযরত মাও সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালাই ইতিরাযাত কী তাহকীক: ১৪, সাআদত নামা: ৫]

ভ্রান্তির খন্ডন

মাও. সাদ সাহেবের দৃষ্টিতে তাওবার চতুর্থ শর্ত হচ্ছে ‘খুরুজ’, যা সকলেই ভুলে গেছেন। তিনি এ চতুর্থ শর্তটি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন? কুরআনের কোন্ আয়াত বা কোন্ হাদীস থেকে এ শর্ত উদ্ভাবিত? আল্লাহ-ই ভালো জানেন; বরং কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য তো এর বিপরীত।

- আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (سورة النساء: ১১০)

অর্থ, “আর যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও করুণাময় পায়”। (সূরা নিসা: ১১০)

- হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বলেন-

عن أبي بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من رجل يذنب ، ثم يقوم فيتطهر ، ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له ، (سنن الترمذی: ৪০৭২)

অর্থ, যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করে, অতঃপর উঠে ওযু করে, অতঃপর নামায পড়ে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ইসতেগফার করে আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই ক্ষমা করেন।” (সুনানে তিরমীযি: ৪০৯২)

- আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. স্বরচিত গ্রন্থে এ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এর সারসংক্ষেপ হলো, হযরত মূসা আ. এর যুগে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। তিনি বারবার দু'আ করার পরও বৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. কে জানালেন, তোমার সভায় একজন লোক রয়েছে যে চল্লিশ বছর ধরে পাপ কাজে লিপ্ত। তার কারণে বৃষ্টি হচ্ছে না। হযরত

মূসা আ. ঘোষণা দিলেন, সে যেন সভাস্থল ছেড়ে চলে যায়। তার ঘোষণার পরও সভাস্থল থেকে কেউ উঠল না। কিন্তু প্রবল বৃষ্টি শুরু হলো। হযরত মূসা আ. আবার দুআ করলেন। তখন আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. কে জানানলেন, সে ব্যক্তি তাওবা করে ফেলেছে। সে আর এখন অপরাধী নয়। (কিতাবুত তাওয়াবিন: পৃ. ৬৪)

এ ঘটনায় প্রমাণিত যে, গুনাহগার ব্যক্তিটি সভাস্থলেই বসে ছিল। সে তাওবা করার পর সে খুরুজ না করেই তার তাওবা কবুল হয়েছে। তাহলে বুঝা গেলো, তাওবার পরিপূর্ণতার জন্য খুরুজ শর্ত নয়।

মাও. সাদ সাহেবের তাওবার কবুল বা তাকমিলের জন্য নব উদ্ভাবিত চতুর্থ নম্বর ‘খুরুজ’ শর্তটি কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত নয়। পৃথিবীর কোন আহলে হক উলামা ফুকাহা তার উদ্ভট বক্তব্যের সাথে একমত নন। তাওবা কবুল বা তাকমিলে তাওবার জন্য যদি খুরুজ শর্ত হয় তাহলে নসের দলীল পেশ করতে হবে।

তাওবার শর্তাবলী:

● ইমাম নববী রহ. বলেন-

التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط : أحدها : أن يقطع عن المعصية . والثاني : أن يندم على فعلها . والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته . وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه . وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفو ، وإن كانت غيبة استحلها منها . ويجب أن يتوب من جميع الذنوب ، فإن تاب من بعضها صححت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي .

“প্রত্যেক গুনাহের জন্য তাওবা করা ওয়াজিব। গুনাহটি যদি আল্লাহ ও বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হয়, অন্য কোন বান্দার সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয়। তাহলে এমন গুনাহের তাওবা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। প্রথম শর্ত: গুনাহকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত: কৃত গুনাহটির জন্য লজ্জিত হতে হবে। তৃতীয় শর্ত: ভবিষ্যতে তা আর না করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। এ তিনটির কোন একটি শর্ত বাদ পড়লে তাওবা বিশুদ্ধ হবে না। আর গুনাহটি যদি বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হয় তবে তাওবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত চারটি। যথাক্রমে উল্লিখিত তিনটি এবং চতুর্থ শর্তটি হচ্ছে, যার হক নষ্ট হয়েছে তা ফেরৎ দেয়া বা ক্ষমা চেয়ে নিজেকে মুক্ত করা। যদি কারো সম্পদ কুক্ষিগত করে থাকে তবে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি করো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে, তবে তাকে অপবাদের শাস্তি হিসেবে নিজেকে পেশ করবে। হয় প্রতিশোধ নাও, নয় ক্ষমা করে দাও। যদি কারো গীবত করে, তবুও তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এ ছাড়াও অন্য সব গুনাহের তাওবা করা ওয়াজিব। যদি সমূহ গুনাহ থেকে তাওবা না করে, কোন কোন গুনাহ থেকে তাওবা করে, তাহলে যে কয়টির বিষয়ে তাওবা করবে সে কয়টির তাওবা শুদ্ধ হবে। অবশিষ্ট অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে তাওবা করা তার উপর জরুরী হিসেবে বাকি থেকে যাবে।” (রিয়াজুস সালাহীন: পৃ.১৮)

● আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ., ইমাম নববী রহ., আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ., আল্লামা আব্দুল্লাহ আল আনসারী রহ.সহ বিজ্ঞ আলেমদের প্রায় সকলেই লিখেছেন যে,

وشرائط التوبة ثلاثة أشياء الندم والاعتذار والإقلاع

অর্থ, তিনটি বিষয় তাওবার শর্ত। অনুতপ্ত হওয়া, মাফ চাওয়া এবং প্রত্যাবর্তন করা।” (মানাযিলুস সাইরীন: পৃ. ১৩ আত তাওবা ওয়াল ইসতিগফার: পৃ.১০, মাদারিজুস সালাহীন: ১/১৬৫, শরহে মুসলিম লিন নববী: ৯/২১৬)

উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈলের ৯৯ জন হত্যাকারী ব্যক্তির তাওবা কবুল সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. গোনাহের স্থান ত্যাগ করার ফযিলত বর্ণনা করেছেন। তিনি তাওবার আগে কিছু শর্তের কথাও বিভিন্ন আলেম থেকে নকল করেছেন। মূলত এগুলো তাওবার শর্ত নয়; বরং তাওবা কবুলের আলামত মাত্র। (উমদাতুল কারী: ১৮/৪১২)

তাছাড়া এ সমস্ত বিষয়ের মাঝে খুরুজের শর্ত কেউ উল্লেখ করেননি। স্থান ত্যাগের কথা বলেছেন। স্থান ত্যাগ আর তাবলীগের খুরুজ কখনো এক নয়। তাই মাও. সাদ সাহেবের উক্তির পক্ষে ফাতহুল বারীর বিবরণ দলীল হতে পারে না।

[ভ্রান্তি নং আঠার]

মাও. সাদ সাহেব বলেন, আযমগড়ের ইজতেমায় একাধিকবার সুনাত তিন প্রকার বলে বর্ণনা করেছেন। ১। ইবাদতের সুনাত, ২। দাওয়াতের সুনাত, ৩। আচার অভ্যাসের সুনাত। [হযরতজী মাও. মুহাম্মদ সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ইতিয়াযাত কা মুনসিফানা জায়েযাহ: ৫৪, হযরত মাও সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ইতিরাযাত কী তাহকীক: ১৬]

ভ্রান্তির খন্ডন

সুন্নাতে বিষয়ে এই উক্তিটি শরীয়া বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত। সুন্নাত তিন প্রকার নয়। মৌলিকভাবে রাসূল সা. এর সুন্নাত দু প্রকার। সমস্ত উলামা, ফুকাহা এবং মুহাদ্দীসগণ সুন্নাতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। কেউ তিন ভাগে বিভক্ত করেননি।

মুহাদ্দীসীদের পরিভাষায় সুন্নাতে সংজ্ঞা:

- আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন-

وبالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره

অর্থ, “রাসূল সা. এর কথা, কাজ এবং সমর্থনকে সুন্নাত বলা হয়।” (ফাতহুল বারী: ১৩/২৪৫)

ফুকাহাদের পরিভাষায় সুন্নাতে সংজ্ঞা:

السنة هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين من غير افتراض ولا وجوب سواء سلكها الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره ممن هو علم في الدين
অর্থ, “ফরয ও ওয়াজিব ব্যতিত দ্বীনের উপর চলার এমন পথ ও পন্থাকে সুন্নাত বলা হয়, যা রাসূল সা. বা দ্বীনি বিষয়ে পারদর্শী কোন ব্যক্তি প্রবর্তন করেছেন।” (দস্তুরুল উলামা: ২/১৮৪)

সুন্নাতে প্রকার:

- আল্লামা সাইয়েদ শরীফ জুরজানী রহ. বলেন-

وهي أي السنة نوعان سنة هدى ويقال لها السنة المؤكدة كالأذان، والإقامة... وسنن الزائد كأذان المنفرد، والسواك

অর্থ, “সুন্নাত দু প্রকার। ১. সুন্নাতে হুদা, একে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও বলা হয়। যথা. আযান দেয়া, ইকামত দেয়া ইত্যাদি। ... ২. সুন্নাতে যায়েদা। যথা. এককভাবে আযান দেয়া, মেসওয়াক করা ইত্যাদি।” (মুজামুত তারিফাত: পৃ. ১০৫)

- আল্লামা আমিমুল ইহসান রহ. বলেন-

ومن السنن سنة هدى هي ما واطب عليها النبي - ﷺ - مع الترك أحيانا على سبيل العبادة ويقال لها السنة المؤكدة وما كانت على سبيل العادة فهي السنة الزائدة وإن واطب عليها النبي - ﷺ -

অর্থ, “রাসূল সা. এর সুন্নাত সমূহের মধ্যে কিছু রয়েছে সুন্নাতে হুদা। সেগুলোর আমল তিনি মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ইবাদতের ভিত্তিতে আদায় করতেন। এগুলোকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও বলা হয়। আর তিনি যে আমলগুলো অভ্যাসের ভিত্তিতে করতেন সেগুলোকে সুন্নাতে যায়েদা, সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদাহ এবং সুন্নাতে আদিয়াও বলা হয়।” (কাওয়াইদুল ফিকহ: পৃ. ৩২৮)

সুন্নাতে ইবনে মাজাহ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘তাকমিলুল হাজাহ’য় রয়েছে-“রাসূল সা. যে সকল আমলসমূহ সম্পাদন করেছেন তা কিছু ইবাদতের ভিত্তিতে, আর কিছু অভ্যাসের ভিত্তিতে। যে সকল কাজ তিনি ইবাদতের ভিত্তিতে করেছেন সেগুলোকে শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাতে হুদা বলা হয়, যা প্রকৃত পক্ষে দ্বীনের পরিপূর্ণতার জন্যই করা হয়ে থাকে এবং না করার দরুণ তিরস্কৃত হয়ে থাকে। যেমন আযান ও ইকামত দেয়া, ওযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া। এছাড়াও অন্যান্য সুন্নাতগুলো রাওয়াতিবের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত: রাসূল সা. যে আমলগুলো মানবিক অভ্যাসের ভিত্তিতে করেছেন সেগুলো নিঃসন্দেহে উম্মতের জন্য হেদায়তের প্রদীপ এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এগুলোকে শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাতে যায়েদা বলা হয়। কেউ যদি এগুলোকে ছেড়ে দেয় তবে সে নিন্দনীয়। যেমন রাসূল সা. ‘কদু’ পছন্দ করতেন।” (তাকমিলুল হাজাহ: পৃ. ১২)

সুতরাং মাও. সাদ সাহেব সকল ফকীহ, মুহাদ্দীসদের বিপরীতে দাওয়াতের সুন্নাত নামে নতুন সুন্নাতে উদ্ভাবন একটি বিদআতী কথা ও শরীয়তে বিকৃতি।

[ভ্রান্তি নং উনিশ]

মাও. সাদ সাহেব বলেন- “দাওয়াতের পথ হলো নবীর পথ, তাসাউফের পথ নবীর পথ না।” [হযরতজী মাও. মুহাম্মদ সাদ সাহেব পর হোনে ওয়ালী ইতিয়াযাত কা মুনসিফানা জায়েযাহ: ৮৫]

ভ্রান্তির খন্ডন

এই উক্তিটি কুরআন-হাদীস ও শরীয়ত বিরোধী বক্তব্য।

- আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ [النساء: ৬৭]

অর্থ- “হে রাসূল, আপনি পৌঁছে দিন, যা কিছু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে।” এখানে ‘ما’ ‘মাউনযিলা’ এর মধ্যে রয়েছে ওহীয়ে মাতলু এবং ওহীয়ে গাইরে মাতলু। অর্থাৎ পরিপূর্ণ কুরআন ও সমস্ত হাদীস। অতএব পূর্ণ কুরআন ও সমস্ত হাদীসের শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদানই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ তাবলীগ।

মাও.সাদ সাহেবের এ উক্তির মাধ্যমে দু'টি অভিযোগ উত্থাপিত হয়-

১। শুধু দাওয়াতই নবীর কাজ, দ্বীনের আর কোন কাজ নবীর কাজ নয়।

২। তাসাউফ নবীওয়ালা কাজ নয়।

প্রথম অভিযোগের জবাব।

- আল্লাহ তাআলা নবীওয়ালা কাজ সম্পর্কে বলেন-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة البقرة: ١٢٩)

অর্থ- “হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।” (সূরা বাকারা: ১২৯)

- আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (سورة

ال عمران: ١٦٤)

অর্থ- “আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।” (সূরা আলে ইমরান: ১৬৪)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূল সা.কে তিনটি কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১। আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআনকে পৌঁছে দেয়া।

২। কুরআন ও হিকমতের তালিম। কুরআনের বিধানাবলী এবং সুন্নাতে নববীর শিক্ষা দেয়াও এর অন্তর্গত।

৩। তাফকিয়া তথা তাসাউফ শিক্ষা দেয়া।

নিঃসন্দেহে দাওয়াত নবীর কাজ, নবীওয়ালা পথ। কিন্তু দাওয়াতই একমাত্র নবীওয়ালা কাজ নয়। তিনি শুধু দাওয়াতের কাজকে নবীওয়ালা কাজ বলে দাবী করে অবশিষ্ট নবীওয়ালা কাজগুলোকে অস্বীকার করেছেন।

- উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা মুফতি শফী রহ. পয়গাম্বর প্রেরণের তিনটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন, “এসব আয়াতে রাসূল সা.এর জগতে পদার্পণ ও তার রিসালাতের তিনটি লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। ১. কুরআন তিলাওয়াত ২. আসমানী গ্রন্থ ও হিকমত শিক্ষা দান ৩. মানুষের চরিত্র পরিশুদ্ধ করা।” (মাআরিফুল কুরআন: ১/৩১১)

দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব:

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, তাসাউফও নবীওয়ালা কাজ, যাকে প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ নেই। কারণ এর পশ্চাতে রয়েছে কুরআনের সুস্পষ্ট দলীল।

- আল্লাহ তাআলা বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (الشمس: ৯)

অর্থ- “যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।” (সূরা শামস: ৯)

- এ আয়াতের প্রেক্ষিতে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. লিখেছেন-

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ، أَي: بِطَاعَةِ اللَّهِ -كَمَا قَالَ قَتَادَةُ- وَطَهَرَهَا مِنَ الْأَخْلَاقِ الدَّنِيئَةِ وَالرَّذَائِلِ. وَيُرْوَى نَحْوَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعُكْرَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جَبْرِ.

অর্থ, “যে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে সে সফলকাম হবে। আর যে আল্লাহর আনুগত্য বর্জন করে নিজেকে কলুষিত করবে সে ব্যর্থ হবে। হযরত কাতাদা বলেন- যে কুআচরণ ও কুপ্রভাব থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে সে সফলকাম হবে। হযরত মুজাহিদ, হযরত ইকরামা, হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৬৬৬)

- আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. লিখেছেন, “تَزْكِيَّة শব্দের প্রকৃত অর্থ আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতা।” (সূরা আশ শামসের তাফসীর দ্র.)
- হাদীসে জিবরাঈলের মধ্যে ইহসানের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত এই ইহসানটি-ই হচ্ছে তাসাউফের অবয়ব। সহীহ বুখারীতে রয়েছে-

قال يا رسول الله ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك (صحيح البخاري: رقم الحديث: ٤٧٧٧)

অর্থ, ইহসান হচ্ছে এমন ভাবে ইবাদত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাও। সুতরাং তাসাউফ হলো ইহসানের নাম।” (সহীহ বুখারী: ৪৭৭৭)

- ফাতাওয়ায়ে হক্কানীয়াতে রয়েছে, “ইহসানের স্তর এবং আত্মশুদ্ধি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী। অধিকাংশ মাশায়েখগণ এ কথার উপর ঐক্যমত যে, বর্তমান সময়ে ইহসান ও আত্মশুদ্ধি তাসাউফের পথেই অর্জিত হয়। ইহসানের স্তরের ব্যাপারে রাসূল সা.বলেন, তুমি এমন ভাবে ইবাদত করো যেন আল্লাহকে দেখতে পাও। অন্যথায় এটা মনে করো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। বাইআত ও তাসাউফের সুনাত রাসূল সা. এর সাহাবীগণ হতে সাব্যস্ত রয়েছে। (ফতোয়ায়ে হক্কানিয়া: ২/২৪৩)
- সুতরাং তাসাউফকে নবী ওয়ালা কাজ অমান্য করা কুরআনের অস্বীকার ও শরীয়তের মৌলিক বিধান লঙ্ঘন। অন্যদিকে তথাকথিত আহলে হাদীসদের ওকালতিও বটে।

মাও. সাদ সাহেবের উপরোক্ত বিভ্রান্তিগুলোর নির্যাস

- ১। মাওলানা সা'দ সাহেবের বিভিন্ন বয়ানের মাঝে কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি আয়াতের تَسْمِيَةً বা মনগড়া তাফসীর করে বসেছেন।
- ২। তার বয়ানে আশ্বিয়ায়ে কেরামের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদায় আঘাত আসে এমন দলীলবিহীন বহু উক্তি প্রকাশ পেয়েছে, যা আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের আকীদা ও আদর্শ পরিপন্থী।
- ৩। ধর্মীয় বিষয়ে তিনি উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম এবং মহান পূর্বসূরীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছেন।
- ৪। কিছু কিছু ফিকহী মাসাইলের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য মুফতিয়ানে কেরামের সম্মিলিত ফতোয়ার বিরুদ্ধে দলীলবিহীন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
- ৫। দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি দ্বীনের অপরাপর শাখাগুলোর ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা করেছেন।
- ৬। মহান পূর্বসূরীদের দ্বীন প্রচারের পুরাতন পদ্ধতিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে দাওয়াতের নিত্য নতুন নিয়ম নীতি আবিষ্কার করেছেন।
- ৭। মাওলানা সা'দ সাহেবের এমন কার্যকলাপের কারণে আকাবির ও আসলাফের সম্মানহানি এবং তাদের প্রতি অনাস্ত্রার সঙ্কট তৈরি হয়েছে। যা তাবলীগ জামাতের ইতিপূর্বকার দায়িত্বশীল হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ. ও হযরতজী এনামুল হাসান রহ. এর নীতি ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

অতএব, মাও. সা'দ সাহেবের উপর্যুক্ত বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি, কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা, বিচ্ছিন্ন আকীদা-বিশ্বাস, মনগড়া উদ্ভাবিত ফতোয়া ও মাসাইল এবং জম্হুর উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিপরীত বিচ্ছিন্ন মতাদর্শ তা শরয়ী দলীল দ্বারাই প্রমাণিত হলো।

[জবাব খ]

মাও. সাদ সাহেব আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত কি না?

মাও. সাদ সাহেব এর উপরোল্লিখিত আকীদা মতাদর্শ কুরআন সুনাতের অপব্যাখ্যা, জম্হুর উম্মতের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে ভুল মাসআলা ও দ্বীনের অপব্যাখ্যার কারণে ভারত উপমহাদেশের হক্কানী উলামায়ে কেরামের শরয়ী বিশ্লেষণ অনুযায়ী তাকে আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলার কোন অবকাশ নেই। নিম্নে আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হলো-

আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের সংজ্ঞা

আহলে সুনাত ওয়াল জামাত একটি পবিত্র জামাতের নাম। হাদীসে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত জান্নাতী দলটির পরিচয় আসছে এভাবে-

وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي (سنن الترمذي: ২৬৬১)

অর্থাৎ যে তরীকার উপর আমি (রাসূল সা.) এবং আমার সাহাবাগণ আছেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে-

وإن هذه الملة ستفرق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. (سنن أبي داود: ৪৫৯৯)

অর্থাৎ যারা সুনাতের রাসূল এবং জামাতাতে সাহাবার উপর প্রতিষ্ঠিত, তারাই জান্নাতী দল। (সুনানে আবু দাউদ: ৪৫৯৯)

সারকথা, ইসলামের যে আকীদা-বিশ্বাস রাসূল সা. এর মতাদর্শ এবং তার সাহাবাগণ দ্বারা অনুসৃত। তাতে বিশ্বাসী মুসলমান হবেন ‘আহলে সুনাত ওয়াল জামাত’। আর রাসূলের মতাদর্শ প্রমাণ হওয়ার জন্য তার সহীহ হাদীসের প্রয়োজন হবে।

সুতরাং রাসূলের সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত অথবা সাহাবাগণের জামাত কর্তৃক সাব্যস্তকৃত বিষয়ের বাইরে চলে গেলে তাকে 'আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতে'র অন্তর্ভুক্ত বলা যাবে না।

আকীদা বিষয়ক বিজ্ঞ আলিমগণ লিখেছেন-

- ১। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কোন কথার বাহ্যিক অর্থ যদি সুন্নাতে রাসূল ও জামাতে সাহাবার মতাদর্শের প্রতিকূল হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে এর বাহ্যিক অর্থ ধর্তব্য হবে না; বরং সুন্নাতে রাসূল ও জামাতে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত মর্ম অনুসারে সেই আয়াত বা হাদীসের ব্যাখ্যা অনুকরণ করতে হবে। অন্যথায় সে আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।
- ২। যদি কুরআন-সুন্নাহর কোন (نص) 'নস' সুস্পষ্ট অর্থবোধক না হয়ে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয় সে ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূল এবং জামাতে সাহাবার আলোকে সে আয়াত বা হাদীসের ব্যাখ্যা নিতে হবে। তাহলে-ই সে 'আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতে'র অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যদি একাধিক অর্থবোধক 'নস' এর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূল ও জামাতে সাহাবার বিপরীতে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা মতে কুরআন হাদীস ব্যবহার করে, তবে সে পথভ্রষ্ট ও আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাত থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য হবে। (আহলে সুন্নাতে পরিচিতি: ১০৩-১০৪)
- আকীদাতুত ত্বাহিযার ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة

[ش] هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، والمراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يسير عليها من قول، أو فعل، أو تقرير، والجماعة هم المسلمون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال، والشذوذ الخروج عن الجماعة، (شرح العقيدة الطحاوية: ص ২৪৩)

অর্থ, আহলে হকের আকীদা হবে আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের ইত্তেবা করা। জমহূরের বিরুদ্ধে গিয়ে ফিরাক ও ইখতিলাফ এবং বিচ্ছিন্নতার শিকার না হওয়া। সুন্নাতে অর্থ রাসূল সা. এর বাণী, আমল, সমর্থনের অনুকরণ। জামাতে অর্থ সাহাবা এবং তাদের অনুসরণকারীদের অনুকরণ। এদের বাহিরে মনগড়া মতামত অবলম্বন জমহূরের বিরোধীতা ভ্রষ্টতা ও আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাত থেকে বিচ্ছিন্নতা। (শরহুল আকিদাতিত তাহাবীয়া: ২৮৩)

তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, খাইরুল কুরুন তথা প্রথম তিন যুগ। যাদের ব্যাপারে রাসূল সা. নিজেই বলেছেন:

"خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" (উত্তম শতাব্দী হচ্ছে, আমার শতাব্দী। অতঃপর তাদের পরবর্তী শতাব্দী। অতঃপর তাদের পরবর্তী শতাব্দী।)

- রাসূল সা. আরো ইরশাদ করেন:

"عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوة الجنة فليزم الجماعة"

(তোমরা জামাতাকে আঁকড়ে ধরো এবং ফিরকা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা শয়তান একার সাথে রয়েছে, দোসর থেকে বহু দূর। অতএব যে জান্নাতে উত্তম স্থান চায় সে যেনো জামাতাকে আঁকড়ে ধরে।)

- জমহূর উম্মতের সাথে থাকার বিষয়ে রাসূল সা. ইরশাদ করেন:

رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما: "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة" وعند ابن ماجة زيادة: "فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم".

(নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কোনো গোমরাহীর উপর পুরো উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করবেন না। অন্য বর্ণনায়: যখন তোমরা দ্বীনের বিষয়ে মতবিরোধ দেখতে পাবে তখন তোমরা জমহূর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অনুসরণ করবে।)

সারকথা, আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাত বলতে উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশেষ শ্রেণী যথা সাহাবা তাবয়ীন ও তাদের অনুসারীদের বুঝানো হয়ে থাকে। যারা মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস এবং জরুরীয়াতে দ্বীনের ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূল ও সাহাবাদের আদর্শের প্রকৃত ধারক-বাহক।

দারুল উলুম দেওবন্দের উলামায়ে কেরামসহ ভারত উপমহাদেশের আস্থাভাজন সংখ্যাগরিষ্ঠ হক্কানী উলামাদের দৃষ্টিতে মাও. সাদ সাহেবের চিন্তা-চেতনা, আকীদা-মতাদর্শ তথা কুরআন-হাদীসের অপব্যখ্যা ও নবী-রাসূলের মর্যাদা বিপন্ন, সাহাবাদের শানের বিপরীত বক্তব্য, হকপন্থী উলামাদের সম্মিলিত ফতোয়া ও মাসলাকের বিপরীত উক্তি ইত্যাদির (যা পূর্বের আলোচনায় পেশ করা হয়েছে) কারণে তিনি আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন।

মাও. সাদ সাহেবের এতাত বৈধ কি না?

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যে কোন আমির নিযুক্ত হলে তাকে মেনে চলা আবশ্যিক। অন্যথায় গুনাহগার হবে। কিন্তু প্রসাশনিক আমীর ছাড়া দ্বীনের অন্যান্য শাখার কাজে আমির মানা শরীয়তের আলোকে মুস্তাহাব। তার অবাধ্যতা গুনাহের কাজ নয়। তবে আমির মেনে চলা প্রশংসনীয়। এমন দ্বীনি কাজে আমীরকে অনুসরণ করতে হলে তিনি অবশ্যই আকীদা-মতাদর্শ, আমল আখলাকের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হক ও হক্কানিয়্যতের ঝাঙাবাহী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শের অনুসারী হওয়া পূর্বশর্ত।

যে আমিরের আকীদা-আদর্শ, চিন্তা-চেতনা কুরআন-সুন্নাহসহ জমহুর উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত নীতি আদর্শের বিরোধী হবে এবং *ما لنا عليه واصحابي* তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন, যামানার আস্থাভাজন সিংহভাগ উলামায়ে হক্কানীর নিকট তার নীতি-আদর্শ প্রশ্নবিদ্ধ ও আপত্তিকর হবে তাকে কোনক্রমেই দ্বীনি কোন কাজের ক্ষেত্রে আমীর মান্য করা বৈধ হবে না।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মাও. সাদ কান্দলভী সাহেবের নীতি-আদর্শ ও চিন্তা-চেতনা বিশ্বের হক্কানী উলামায়ে কেরামের নিকট চরম আপত্তিকর। তার দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শ উলামায়ে দেওবন্দ ও তাদের পূর্বসূরীদের মাসলাক ও মতাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। উলামায়ে দেওবন্দের দৃষ্টিতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাও. সাদ সাহেব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তাই এমন বিতর্কিত ও ভ্রান্ত মতাদর্শের সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দাওয়াত ও তাবলীগের মত মহান দ্বীনি কাজের আমির মান্য করা মোটেই বৈধ বা শরীয়তসম্মত নয়।

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

অর্থাৎ রাসূল সা. বলেন- “একজন মুসলমানের জন্য পছন্দ-অপছন্দ সর্বাবস্থায় আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না তাকে গুনাহের আদেশ করা হয়। (আমীর) যখন তাকে গুনাহের আদেশ করবে তখন তার আনুগত্য বৈধ নয়। (সহীহ বুখারী: হা.নং-৭১৪৪)

- হযরত সওবান রা. বর্ণনা করেন-

عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ: إنما أخاف على أمتي الائمة المضلين.

আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার ভয় শুধুমাত্র পথভ্রষ্টকারী নেতাদের নিয়ে। (সুনানে আবু দাউদ: ৪২৫২ জামে তিরমিযী: ২৩৩০)

- ইমাম রাযী রহ. তাফসীরে কাবীরে লিখেন-

وإعلم أن الإفتاء إنما يجوز بالعالم المهتدي، وإنما يكون عالماً مهتدياً إذا بني قوله على الحجة والدليل فإذا لم يكن كذلك لم يكن عالماً

مهتدياً فوجب أن لا يجوز الإفتاء به. (التفسير الكبير: ৭/১, ৯৭/১, التوفيقية)

অর্থাৎ যে আলেমের কথা দলীলভিত্তিক হবে কেবল তারই অনুসরণ করা যাবে। যদি এমন না হয়, তাহলে তার অনুসরণ বৈধ নয়।

- রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء

حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا (صحيح البخارى: رقم الحديث: ১০০ صحيح مسلم: رقم الحديث: ২৭৭৩)

এই হাদীসের মর্ম হলো, মানুষ যখন বে-ইলম লোকদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে অনুসরণ করবে, তখন যে অনুসরণ করবে এবং যাকে অনুসরণ করা হবে উভয়ই গোমরাহ হবে। (সহীহ বুখারী: হা. ১০০ সহীহ মুসলিম: হা. ২৭৭৩)

- অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ: إنما أخاف على أمتي الائمة المضلين.

আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার ভয় শুধুমাত্র পথভ্রষ্টকারী নেতাদের নিয়ে। (সুনানে আবু দাউদ: ৪২৫২ জামে তিরমিযী: ২৩৩০)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন-

الأئمة جمع إمام وهو مقتدي القوم ورئيسهم ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد

ইমাম বলা হয় কওমের অনুসরণীয় ব্যক্তি এবং নেতাকে। যিনি কওমকে কথা কাজ এবং এতেকাদের দিকে আহ্বান করেন।

(মিরকাতুল মাফাতীহ: ১৫/৩৫৫)

- যিয়াদ ইবনে হুদাইর রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر : هل تعرف ما يهدم الإسلام ؟ قال : قلت : لا . قال : يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين " . (سنن الدرامى: رقم الحديث: ٢٦٩)

আমাকে হযরত উমর রা. বললেন, তুমি কি জানো কি ইসলামকে ধ্বংস করবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, ইসলামকে ধ্বংস করবে আলেমের পদস্থলন, কুরআন শরীফের ব্যাপারে মুনাফিকের বিতর্ক ও পথভ্রষ্টকারী নেতাদের শাসন। (সুনানে দারেমী: হা. ২৬৯)

উপরোল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের বিবরণের আলোকে প্রমাণ হয় যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিরোধী জমহুর উম্মতের মতাদর্শের পরিপন্থী কোন ব্যক্তিকে দ্বীনি কোন কাজের আমীর বানানো বৈধ নয়। কারণ ভুল মতাদর্শের আমীরের পরিচালনা দ্বীনের সহীহ কোন কাজ হতে পারে না; বরং এর দ্বারা মানুষ পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর:

মাও. সাদ সাহেবের রুজু করার দাবী বিভ্রান্তিকর

প্রথম প্রশ্নের জবাবে প্রমাণাদীসহ উল্লেখ রয়েছে যে, মাও. সাদ কান্দলভীর বিভিন্ন বয়ানের মাঝে কুরআন ও হাদীসের ভুল ও অপ্রণিধানযোগ্য ব্যাখ্যা, মনগড়া তাফসীর, নবী-রাসূলদের শানে অবমাননা, সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদায় আঘাত করার মত বহু বিভ্রান্তিকর উক্তি প্রকাশ পেয়েছে। তার এসব উক্তি উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ও মহান পূর্বসূরীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বহির্ভূত এবং তার বহু অভিমত ও ফতোয়া নির্ভরযোগ্য মুফতিয়ানে কেলাম ও মায়হাবের বিজ্ঞ ফকীহগণের ফতোয়ার সাথেও সাংঘর্ষিক। তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব দিতে গিয়ে বয়ানের মাঝে দ্বীনের অপরাপর শাখাগুলোর তীব্র সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। সর্বোপরি তার এসব নীতি আদর্শ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদর্শের পরিপন্থী।

তার এই জাতীয় আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং নব্যমতাদর্শের প্রচার প্রসার বিভিন্ন মজমায় বয়ানের মাধ্যমে গোটা উম্মাহর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার কারণে দাওয়াত ও তাবলীগের মূল কার্যক্রমে মারাত্মক সমস্যা ও ফিৎনা পরিলক্ষিত হওয়ার পর ভারতবর্ষের বিজ্ঞ উলামায়ে কেলাম এবং বিভিন্ন ইলমী মারকায ও স্বয়ং নিজামুদ্দিনের প্রবীণ মুরাব্বীগণের পক্ষ থেকে বারবার সতর্ক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মাও. সাদ সাহেব এগুলো আমলে না নিয়ে তার মিশন চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাকে যারা ইসলাম করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের সাথে বৈরী আচরণ করে যাচ্ছেন।

দেওবন্দের ফতোয়ার প্রেক্ষাপট

অবশেষে তার এসব আপত্তিকর বয়ান বক্তৃতার ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দে দেশ বিদেশ থেকে উপর্যুপরি প্রশ্ন আসতে থাকে। যেহেতু মাও. সাদ সাহেবকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সমস্যাগুলো বিশাল জনগোষ্ঠির সাথে সম্পৃক্ত তদুপরি এমন একটি দ্বীনি কাজের সঙ্গে বিষয়গুলো জড়িত যার পরিধি দুনিয়ার সবগুলো দেশে বিস্তৃত। এজন্য দারুল উলুম দেওবন্দ এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্ক পদ্ধতি অবলম্বন করে ইতিবাচক পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু যখন সংশোধনের সকল পদক্ষেপ ব্যর্থ হতে লাগল তখন দারুল উলুম দেওবন্দ মাও. সাদ সাহেবের আপত্তিকর উক্তিগুলোর সত্যতা নিখুঁতভাবে যাচাই-বাচাইপূর্বক একটি (متفقہ) 'সর্বসম্মত অবস্থান' এর নামে ফতোয়া তৈরি করে। মাও. সাদ সাহেব বিষয়টি জানতে পেয়ে ভুল থেকে "রুজু" করবেন মর্মে সংবাদ দিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দে লোক পাঠান। অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দ তাদের ফতোয়ার অনুলিপি প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে মাও. সাদ সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেন। উক্ত ফতোয়ার মধ্যে সংক্ষেপে তার সাতটি ভুলের উল্লেখ করা হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে তিনি ভুলগুলো থেকে নিঃশর্ত "রুজু" করতে গিয়ে চারটি পত্র লিখতে হয়েছে।

প্রথম পত্র:

এ চিঠিতে মাও. সাদ সাহেব “রুজুর” কথা বলে সঙ্গে নিজের (ভুল) বক্তব্যের পক্ষে পরবর্তীতে দলীল প্রমাণ পেশ করার দাবী করেন। অধিকন্তু তাঁর প্রতি দেওবন্দ আকাবিরদের বদগুমানী ও অহেতুক কুধারণার অভিযোগ করেন। উল্লেখ্য, রুজু করার অর্থ হল ভুল স্বীকার করে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা। তিনি রুজুর কথা বলে নিজের ভুলগুলো সঠিক প্রমাণের দলীল পেশ করার অর্থ হল তিনি আসলে ভুল-ই স্বীকার করেননি। অপরদিকে যারা তার ভুল ধরে দিলেন তাদেরকে তার প্রতি বদগুমানীর অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন, এসবগুলো স্ববিরোধী কথাবার্তা। তাই প্রথম পত্রটির ‘রুজু’ দারুল উলুম দেওবন্দের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি।

দ্বিতীয় পত্র:

এবার মাও. সাদ সাহেব তার ভ্রান্তিগুলোর সঠিক প্রমাণের দলীলপ্রমাণ পেশ করার দাবী ও বদগুমানীর অভিযোগ বাদ দিয়ে পুনরায় দারুল উলুম দেওবন্দে “রুজু নামা”র চিঠি প্রেরণ করেন। কিন্তু এই চিঠি প্রেরণের মাত্র দুই দিন পরেই নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালী মসজিদের আম বয়ানে দেওবন্দের ফতোয়ায় উল্লিখিত সবচেয়ে মারাত্মক ভুল তথা হযরত মূসা আ. এর মর্যাদা পরিপন্থী বক্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করে বসেন।

উল্লেখ্য, একদিকে পত্রের মাধ্যমে রুজুর দাবী, অন্যদিকে আম বয়ানে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি বড়-ই কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ ও হাস্যকর ব্যাপার। তাই কথা আর কাজে মিল না থাকায় দারুল উলুম দেওবন্দের নিকট এই দ্বিতীয় “রুজু”ও গ্রহণযোগ্য হয়নি।

তৃতীয় পত্র:

মাও. সাদ সাহেব তৃতীয়বারের মতো আরেকটি রুজু নামা প্রেরণ করেন। এতে নিঃশর্তে রুজু করার কথা লিখলেও হযরত মূসা আ. কে কেন্দ্র করে যে বক্তব্য নিজামুদ্দিন মসজিদে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন সে ব্যাপারে লিখেন যে, “তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য (অর্থাৎ নবী মূসা আ. এর মর্যাদায় আঘাতকারী বক্তব্যটি) কে ভিত্তিহীন বলা যায়।” نعوذ بالله

উল্লেখ্য মাও. সাদ সাহেবের এ ধরনের ডিগবাজীর কারণে (কখনও ভুল থেকে রুজু/তাওবা আবার কখনো তা সঠিক প্রমাণের দাবী। কখনো নিঃশর্তে তাওবা আবার কখনো নিজ বক্তব্য ভিত্তিহীন নয় বলার দাবী।) দারুল উলুম দেওবন্দের নিকট এই “রুজু”ও গ্রহণযোগ্য হয়নি।

মাও. সাদ সাহেব বারবার রুজু করার কথা চিঠিতে লেখার পরও মিস্বারে বসে সে ভুল কথাগুলো বয়ানে পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, যা লিখেন তার উপর আমল করেন না; বরং চিঠিতে রুজু আর বয়ানে সে একই ভুল বলেন, এসব ডিগবাজীর কারণে দারুল উলুম দেওবন্দ সাফ বলে দিয়েছে যে, “এমন লিখিত “রুজু”র কোন অর্থ হয় না, কাগজের রুজু যথেষ্ট নয়। লিখিত রুজুর আর প্রয়োজন নেই; বরং তিনি লাখো মানুষের মজমায় যে ভুল বক্তব্যগুলো দিয়েছেন, লাখো মানুষের মজমায়-ই সে ভুল বক্তব্যগুলো থেকে তার রুজু করতে হবে। অর্থাৎ ভুলগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে সঠিক কথাগুলো মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে।”

- বিশিষ্ট তাবেয়ী ইমাম মায়মুন ইবনে মিহরান রহ. বলেন-

مَنْ أَسَاءَ سِرًّا فَلْيَتُوبْ سِرًّا ، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَانِيَةً فَلْيَتُوبْ عَلَانِيَةً . (حلية الاولياء لابن نعيم: ١١٥/٢)

অর্থাৎ গোপনে করা অপরাধের জন্য গোপনে তাওবা, আর প্রকাশ্যে করা গোনাহের জন্য প্রকাশ্যে তাওবা করতে হবে।

চতুর্থ পত্র:

এরপর মাও. সাদ সাহেব হযরত মূসা আ. এর ঘটনার ব্যাপারে নিঃশর্ত রুজুর কথা লিখে চতুর্থ চিঠি দেওবন্দে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি ভুল স্বীকার করে স্পষ্টভাবে রুজুর ব্যাপারটি আম বয়ানে প্রকাশ করেননি; বরং উল্টো তার সমর্থকরা তার ভুলসমূহের পক্ষে অপব্যখ্যামূলক বইপত্র লেখা ও প্রচার করার বিরামহীন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

দেওবন্দের সর্বশেষ অবস্থান:

মাওলানা সা'দ সাহেব কর্তৃক চারবার রুজুনামা প্রেরণ করার পর এবং রুজুর পরেও তার বিভিন্ন বয়ানে ক্ষণে ক্ষণে বিতর্কিত বিষয়গুলো পুনরাবৃত্তি করার কারণে পরিশেষে দারুল উলুম দেওবন্দ ‘সর্বসম্মত অবস্থান’ নামে প্রকাশিত তাদের পূর্বের ফতোয়া বহাল রেখে ৩১ জানুয়ারী ২০১৮ তে সর্বশেষ অবস্থান ব্যক্ত করেন (ফতোয়া জারি করেন)।

দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়ায় বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে-

اس موقع پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا کے رجوع کو اس ایک واقعے کی حد تک تو قابل اطمینان قرار دیا جاسکتا ہے؛ لیکن دارالعلوم کے موقف میں اصلاً مولانا کی جس فکری بے راہروی پر توثیق کا اظہار کیا گیا تھا، اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا؛ اس لئے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں، جن میں وہی مجتہد انداز، غلط استدلال اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں؛ بلکہ دیگر علمائے حق کو بھی مولانا کی مجموعہ فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔

ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہم اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے، مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے؛ کیونکہ مولانا موصوف کے ان دوراز کار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا خواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہیں جو اہل السنۃ والجماعت اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔

এ কথা স্পষ্ট করা দরকার যে, শুধু মুসা আ. এর ঘটনার ক্ষেত্রে মাওলানা সা'দ সাহেবের রুজুর ব্যাপারে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু দারুল উলুম দেওবন্দের “অবস্থান” এ মাওলানা সা'দ সাহেবের যে আদর্শিক ভ্রান্তির উপর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিলো তা প্রত্যাহার করা এখনো সম্ভব নয়। কারণ একাধিকবার রুজু করার পরও মাঝে মাঝে বিভিন্ন সময় মাওলানা সা'দ সাহেবের মুখ থেকে একের পর এক এমন নিত্য নতুন বক্তব্য শোনা যাচ্ছে, যেখানে আগের মতই নিজস্ব ইজতিহাদ, ভুল দলিলবাজি ও দাওয়াতের মেহনত সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তাধারার উপর কুরআন-সুন্নাহর ভুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার কারণে শুধু দারুল উলুম দেওবন্দ সংশ্লিষ্ট উলামায়ে কেরামই নন অন্যান্য হকপন্থী আলেমগণও মাওলানা সা'দ সাহেবের সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মারাত্মক অসন্তুষ্ট। আমরা মনে করি আকাবির রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামান্য বিচ্যুতিও তীব্র ক্ষতিকর। মাওলানা সা'দ সাহেবকে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পূর্বসূরীদের পথের পথিক হয়ে শরীয়তের ভাষ্য থেকে নিজস্ব এই ইজতিহাদের ধারা বন্ধ করতে হবে। কেননা, মাওলানা সাদের এই মূলচ্যুত ইজতিহাদপনা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে খোদা নাখাস্তা তিনি এমন একটি নতুন ফিরকা তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছেন যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বিশেষত আমাদের আকাবির রহ. এর মতাদর্শ থেকে ভিন্ন হবে। আল্লাহ পাক সবাইকে আকাবিরের পথের উপর অবিচল রাখুন। আমীন॥

মূল উত্তর:

দারুল উলুম দেওবন্দের উপরোক্ত রুজু সংক্রান্ত বিষয়ে সব বিবরণগুলোর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, মাওলানা সা'দ সাহেব কর্তৃক রুজু নামা দারুল উলুম দেওবন্দের নিকট গৃহিত হওয়ার দাবী সঠিক নয়; বরং বিভ্রান্তিকর। কেননা,

১. দারুল উলুম দেওবন্দ মাওলানা সা'দ সাহেব এর আপত্তিকর ব্যাখ্যার ব্যাপারে পূর্বে নিজেদের যে সর্বসম্মত অবস্থান স্পষ্ট করেছিলো সে অবস্থান নিজ স্থলে আজ পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে, নিজ অবস্থান থেকে সরে আসেনি; বরং দেওবন্দ সর্বাবস্থায় মাওলানা সা'দ সাহেব এর বক্তব্যগুলোকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে।
২. তাছাড়া দারুল উলুম দেওবন্দ মাও. সা'দ সাহেবকে তার ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে বিরত থাকা ও স্পষ্ট ভাষায় আম বয়ানে রুজু করার যে অনুরোধ করেছিলো তা এখনও পূর্ণ হয়নি; বরং তিনি রুজু নামার পরও বিভিন্ন সময়ে একের পর এক নিত্য নতুন ভুল বক্তব্য, মনগড়া ইজতিহাদ, শরীয়ী দলীলের অপপ্রয়োগ, দাওয়াত সম্পর্কে গলত দৃষ্টিভঙ্গি এবং কুরআন-সুন্নাহর অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা চালিয়ে যাওয়ার কারণে দারুল উলুম দেওবন্দ তার উপর কঠিন অনাস্থা ব্যক্ত করেছে।
৩. দারুল উলুম দেওবন্দ মাও. সা'দ সাহেব সম্পর্কে নতুন এমন ফিরকা তৈরী করার উদ্যোগী হওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, বিশেষত আকাবিরে দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শ থেকে ভিন্ন। সুতরাং ‘মাও. সা'দ সাহেব রুজু করে নিয়েছেন’ এ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিকর।

- আল্লামা ইবনুল লাহ্‌হাম রহ. বলেন-

الرجوع لا يكون إلا بعد استقرار الحكم والاستثناء مانع من استقرار الحكم (القواعد والفوائد الأصولية: رقم القاعدة: ٦٢)

অর্থাৎ পূর্বের মত ছেড়ে নতুন মতটির উপর দৃঢ় ও স্থির প্রমাণিত হওয়ার পরই তা রুজু হিসাবে স্বীকৃত হয়। আর রুজুর মধ্যে কোনো শর্তারোপ করলে তা স্থির বা দৃঢ় হয় না; রুজুও হয় না। (আল-কাওয়াদ ওয়াল ফাওয়াদ আল-উসুলিয়াহ: নং ৬২)

- বিশিষ্ট তাবেয়ী ইমাম মায়মুন ইবনে মিহরান রহ. বলেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، ثنا أَبُو الْمَلِجِ، عَنْ مُيْمُونٍ، قَالَ: "مَنْ أَسَاءَ سِرًّا فَلْيَتُبْ سِرًّا، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَانِيَةً فَلْيَتُبْ عَلَانِيَةً، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ وَلَا يُعْزِرُ، وَالنَّاسُ يُعْزِرُونَ وَلَا يُغْفِرُونَ." (حلية الاولياء لابن نعيم: ١١٥/٢)

অর্থাৎ গোপনে করা অপরাধের জন্য গোপনে রুজু/তাওবা, আর প্রকাশ্যে করা গোনাহ/অপরাধের জন্য প্রকাশ্যে রুজু/তাওবা করা উচিত।

তিন নং প্রশ্নের উত্তর

মাও. সাদ সাহেবকে আমীর বানানো বৈধ নয়।

আমরা উপরে প্রথম প্রশ্নের [গ] এর জবাবে আমীরের গুণাবলী সম্পর্কে শরয়ী দলীলসহ দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছি।

একটি বড় ভুল:

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, মাওলানা সা'দ সাহেব ও তার অনুসারীদের অন্যতম মারাত্মক ভুল হলো, হাদীস শরীফে যে আমীরের আনুগত্যকে রাসূল সা. এর আনুগত্য এবং যার অবাধ্যতাকে রাসূলের অবাধ্যতা সাব্যস্ত করা হয়েছে, মাওলানা সাদ সাহেবকে সে আমীরের প্রতিপাদ্য মনে করা হয়। এটা এসব হাদীসের অপপ্রয়োগ ও অপব্যাখ্যা। হাদীস সমূহের বর্ণনা, মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য এ ব্যাপারে স্পষ্ট, যে আমীরের আনুগত্য সকলের উপর আবশ্যিক তিনি হলেন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত বিভিন্ন শাখার আমীর। সাধারণ কোন দ্বীনি সংগঠন বা জামাতের আমীর উক্ত আমীরের প্রতিপাদ্য নয়। কেননা, এধরনের কোন সংগঠন বা জামাতে অংশগ্রহণ করা কারো উপর ওয়াজিব-ই নয়। কেউ অংশগ্রহণ করলেও সর্বদা তাতে থাকা ওয়াজিব নয়। তবে কোন সংগঠন শরীয়ত সম্মতভাবে পরিচালিত হলে তাতে যারা অংশগ্রহণ করবে তারা সংগঠনের আমীরকে মেনে চলবে। যখন শরীয়তসম্মতভাবে পরিচালিত হবে না, তখন আমীরকে মান্য করা তো দূরের কথা, সংগঠন ত্যাগ করাই কর্তব্য হবে। এটা একটি সর্বস্বীকৃত নীতিমালা।

দাওয়াত ও তাবলীগের মহান দ্বীনি কাজটি কোন ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে না এবং প্রশাসনিক কোন দায়িত্ব পালন তাদের ইখতিয়ারভুক্ত নয়। এমন দ্বীনি কাজকে শরীয়তের ভাষায় (امارة صغرى) এমারতে ছুগরা বলা হয়। এমন দ্বীনি কাজে আমীর নিযুক্ত করা ও আমীরকে মেনে চলা একটি মুস্তাহাব আমল। ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। এ ক্ষেত্রেও কুরআন-হাদীসের আলোকে আমীরের যে গুণাবলী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে তা অবশ্যই তার মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। অন্যথায় তার এতাআত ও অনুকরণ বৈধ নয়।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মাও. সাদ কান্দলভী সাহেবের নীতি-আদর্শ ও চিন্তা-চেতনা যেহেতু আহলে হক্‌ উলামায়ে কেরামের নিকট চরম আপত্তিকর, তার আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা উলামায়ে দেওবন্দের আকীদা-আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই এমন ভ্রান্ত মতাদর্শের অধিকারী ব্যক্তিকে দাওয়াত ও তাবলীগের মতো মহান দ্বীনি কাজের আমীর মান্য করা মোটেই বৈধ বা শরীয়তসম্মত নয়। তার সকল ভুল ভ্রান্তি এবং শরীয়ত বিরোধী দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে খালিস মনে তাওবা করা পর্যন্ত তার অনুকরণে দ্বীনি কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণও বৈধ হবে না।

উপরন্তু এমন ব্যক্তির আমরণ এতাআত ও অনুকরণ করাকে আবশ্যিক মনে করা এবং এ ব্যাপারে এফিডেভিট করার মাধ্যমে তার এতাআতকে নিজের উপর আবশ্যিক করে নেয়া সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী ও অবৈধ আমল।

● হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত-

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (صحيح مسلم: ১৭১৮)

যার আমল রাসূলের আদর্শ ভিত্তিক হবে না তার আমল বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। (সহীহ মুসলিম: ১৭১৮)

● হযরত ইয়াযিদ ইবনে উমাইরা রা. থেকে বর্ণিত-

فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر ، فيوشك قائل أن يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره ، فإياكم وما ابتدع ، فإن ما ابتدع ضلالة ، وأحذركم زيفه الحكيم ، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم ، وقد يقول المنافق كلمة الحق ، قال : قلت لمعاذ : ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق ؟ قال : بلى ، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ، ولا يثنيك ذلك عنه ، فإنه لعله أن يراجع ، وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا ، (سنن أبي داود: ৪৬১১)

একদিন মুআয ইবনে জাবাল রা. বললেন, নিশ্চয় তোমাদের সামনে ফিতনাসমূহ আসছে। সম্পদ বেড়ে যাবে, কুরআন খুলে দেয়া হবে। এমনকি মুমিন-মুনাফিক, পুরুষ মহিলা, ছোট বড় ও গোলাম স্বাধীন সবাই কুরআন পড়বে। কেউ (মনে মনে) বলবে মানুষ আমার অনুসরণ করে না কেন? আমি তো কুরআন পড়েছি। তারা আমার অনুসরণ করবে না, যতক্ষণ না আমি তাদের জন্য নতুন কিছু আবিষ্কার করবো। সুতরাং সে যা আবিষ্কার করবে তা থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। কেননা, সে যা আবিষ্কার করবে তা হবে

গোমরাহী। আমি তোমাদেরকে জ্ঞানীর পদস্থলন থেকে সতর্ক করছি। কেননা, শয়তান অনেক সময় জ্ঞানী ব্যক্তির জবানে গোমরাহীর কথা বলে, আবার কখনো মুনাফিকও হক কথা বলে। ইয়াযিদ বলেন, আমি বললাম আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন! জ্ঞানী কখন গোমরাহীর কথা বলে, মুনাফিক কখন হক কথা বলে সেটা আমি কিভাবে বুঝব? তিনি বললেন, জ্ঞানীর অপরিচিত ও নতুন কথা থেকে বেঁচে থাকবে। যে কথার ব্যাপারে বলা হয় এটা কী? (অর্থাৎ যে কথার উপর উলামায়ে কেরাম আপত্তি করেন) তবে এর কারণে জ্ঞানী থেকে বিমুখ হয়ে যাবে না। (তাকে বুঝানোর চেষ্টা করবে।) হয়তো সে ফিরে আসবে বা তাওবা করে নিবে। হক কথা যখন শ্রবণ করবে (মুনাফিক থেকে হলেও) গ্রহণ করবে। কেননা হক কথায় নুর থাকে। (সুনানে আবু দাউদ: হা. ৪৬১১)

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
অর্থাৎ রাসূল সা. বলেন- “একজন মুসলমানের জন্য পছন্দ-অপছন্দ সর্বাঙ্গীয় আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না তাকে গুনাহের আদেশ করা হয়। (আমীর) যখন তাকে গুনাহের আদেশ করবে তখন তার আনুগত্য বৈধ নয়। (সহীহ বুখারী: হা.নং-৭১৪৪)

- হযরত সওবান রা. বর্ণনা করেন-

عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.
আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার ভয় শুধুমাত্র পথভ্রষ্টকারী আমীর/নেতাদের নিয়ে। (সুনানে আবু দাউদ: ৪২৫২ জামে তিরমিযী: ২৩৩০)

- যিয়াদ ইবনে হুদাইর রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين.
(سنن الدرামী: رقم الحديث: ২৬৯)

আমাকে হযরত উমর রা. বললেন, তুমি কি জানো কী ইসলামকে ধ্বংস করবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, ইসলামকে ধ্বংস করবে আলেমের পদস্থলন, কুরআন শরীফের ব্যাপারে মুনাফিকের বিতর্ক ও পথভ্রষ্টকারী নেতাদের শাসন/ইমারত। (সুনানে দারেমী: হা. ২৬৯)

আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সা. ব্যতীত কোন ব্যক্তি এতাতাযোগ্য নয়। তবে যে ব্যক্তি শরীয়তের ইলমের অধিকারী এবং ইলম অনুযায়ী শরীয়তের বিধিবিধান বর্ণনা করে, তাকে একজন আলেমেদ্বীন হিসেবে অনুসরণ করা যাবে। তার ব্যক্তিত্বের কারণে নয়। তাই সে যদি কখনো শরীয়তের বিধান ভুল বলে তখন তাকে অনুসরণ করা বৈধ নয়। ইমাম শাতেবী ‘আল ইতেসাম’ কিতাবে সবিস্তারে এ মাসআলা দলীল প্রমাণসহ আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এমন অনেক ফিরকার উদাহরণ দিয়েছেন যারা দলীল প্রমাণ বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করার কারণে গোমরাহ হয়েছে। (পৃ. ৫১৭-৫২৭)

হযরত আবু বকর রা. খলীফা হওয়ার পর খুতবায় বলেছেন, আমাকে তোমাদের আমির বানানো হয়েছে অথচ আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই। যদি আমি সঠিক পথে থাকি তবে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি ভুল পথে চলি তবে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/৩৬৫)

উপর্যুক্ত শরয়ী দলীলাদির দ্বারা প্রমাণ হলো, যিনি নিত্য নতুন কথা ইসলামের নামে আবিষ্কার করে যা কুরআন-হাদীস সমর্থিত নয় উম্মাহর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বহির্ভূত, তিনি গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। এমন লোককে আমীর বানানো অবৈধ। আর আমীর বানানোর উপর জেদ করা বা বাড়াবাড়ি করা এবং তার আমীরত্বকে আবশ্যিক করে নেয়া শরীয়ত বিরোধী বিদআতী কাজ। তাই মাও. সাদ সাহেবকে আমীর মান্য করা ও আমীর হিসেবে তার আনুগত্যকে আবশ্যিক মনে করা ভ্রষ্টতা ও বিদআত।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ ও তাদের উপর আক্রমণ হারাম।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে যে কোনো মুসলিম ও মুমিনের জান, মাল ও ইজ্জতের সংরক্ষণ ফরয। আর জান, মাল ও ইজ্জতের উপর অবৈধ পন্থায় আঘাত করা সম্পূর্ণ হারাম। রাসূল সা. বিদায় হজ্বের ভাষণে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে গেছেন-

فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا (صحيح البخارى: رقم الحديث: ৬৭)

কোনো দেশীয় লোক দলবদ্ধভাবে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা আপন দেশের নিরীহ দুর্বল মানুষের উপর আক্রমণ চালানোকে কুরআনের ভাষায় “ফাসাদ” বলা হয়। আক্রমণকারীকে “মুফসিদ” বলা হয়। বাংলায় তাদেরকে জাতীয় অস্ত্রসন্ত্রাসী, ইংরেজীতে টেরোরিস্ট বলা হয়।

১লা ডিসেম্বর টঙ্গীর মাঠে যে দলটি নিরীহ আলেম, ছাত্র ও তাবলীগি সাথী ভাইদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে বাস্তবতার নিরিখে তারা জাতীয় সন্ত্রাসী।

আর এদের ব্যাপারে কুরআনের বিচার হচ্ছে নিম্নরূপ:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورة المائدة: الآية: ٣٣)

উপরোক্ত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে টঙ্গীর ঘটনায় যারা সন্ত্রাস চালিয়ে আলেম ও তাবলীগিদের আঘাত করেছে তাদেরকে দলবলে সাজা দিতে হবে, যারা সরাসরি জড়িত ও সন্ত্রাসী কাজের পরিকল্পনাকারী এবং যারা পরিচালনাকারী সকলেই এই শাস্তির আওতায় আসবে।

এ জাতীয় সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস চার প্রকার:

১। যারা মানুষ খুন করেছে এবং মালপত্র লুণ্ঠন করেছে।

২। শুধু মানুষ খুন করেছে, লুণ্ঠন করেনি।

৩। খুন করেনি, তবে লুণ্ঠন করেছে।

৪। খুন, লুণ্ঠন কোনটাই করতে পারেনি। তবে তারা অপতৎপরতা চালিয়ে মানুষকে আহত, অপদস্থ করেছে।

অতএব, কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত যে, নিরপরাধ ও নিরীহ কোনো মুসলমান বা আলেম উলামা ও তাবলীগী সাথীদের উপর আক্রমণ করা সম্পূর্ণ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। কুরআনের আলোকে সন্ত্রাসীদের বিচার হত্যা, হাত-পা কেটে দেয়া, নির্বাসন করা বা যাবত জীবন কারাদণ্ড দেয়া। আর পরকালে আল্লাহর বিচারে তারা জালিম। তাদেরকে আল্লাহর সামনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এ ধরনের অপরাধী প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না; বরং তারা জালিম ও মহাপাপী। তাই তাদেরকে তদন্ত সাপেক্ষে অবশ্যই আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রশাসনের গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্য।

আর যদি আলেমদের উপর আক্রমণের মূল কারণ হয় যে, ‘তারা আলেম’ তবে আক্রমণকারীদের ঈমানচ্যুত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত বিধানটি সরাসরি হামলাকারী, হত্যাযজ্ঞ পরিচালনাকারী ও পরিকল্পনাকারী সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে আক্রমণ করে হতাহত করা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে দ্বীনি ইলম এর প্রতি বিদ্বেষের কারণে হলে তা হবে সম্পূর্ণ কুফুরী।

শরয়ী প্রমাণাদি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ اِخْتَلَوْا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (৫৮)

“যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।”

(সূরা আহযাব:৫৮)

২। রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

অর্থাৎ “প্রকৃত মুসলমান তারাই, যাদের হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে”। (বুখারী: হা.নং-৯)

৩। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত-

عن أبي هريرة قال قال رسول الله -ﷺ- ... "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا". ويشير إلى صدره ثلاث مرات

«بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه».

অর্থাৎ “এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান-মাল-সম্মানে অনৈতিকভাবে আঘাত হানা সম্পূর্ণ হারাম।” (মুসলিম শরীফ:

হা.নং-৬৭০৬)

৪। আল্লামা শামী রহ. বলেন-

كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التعزير... ذكر في شرحه على الملتقى أيضا أنه لو على وجه المزاح

يعزر فلو بطريق الحقارة كفر؛ لأن إهانة أهل العلم كفر على المختار

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে অন্যায়ভাবে কথা-কর্ম-ইশারার মাধ্যমে কষ্ট দিবে সে শরয়ী আইনে শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।... আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হলে তার উপর কুফুরীর বিধান আরোপ হবে। কেননা, আহলে ইলমকে হেয় প্রতিপন্ন করা কুফুরী।” (ফতোয়ায়ে শামী: খ:৬ পৃ:১১৫, আযহার)

হেনং প্রশ্নের উত্তর

সাদ পন্থীদের সাথে যুক্ত হয়ে তাবলীগের কাজ করা বৈধ নয়।

- মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (سورة النساء: الآية: ১১৫)

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় রাসূল সা. এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের যে ইলমী ও আমলী পথ দিয়েছেন এবং যার উপর সকল ঈমানদারগণ চলেছেন সেই পথ থেকে সামান্য বিচ্যুত হওয়া খুবই বিপদজনক। কুরআন-সুন্নাহ ও জমহুর উম্মতের মতাদর্শ থেকে সামান্যতম সরে পড়া একজন ব্যক্তির জন্য যেমন বিপদ কোনো দলের জন্য আরো কঠিন বিপদ। সুতরাং ইসলামের শিক্ষা এই যে, যে পথের উপর গোটা উম্মাহ তথা উলামায়ে কেরাম, বুয়ুর্গানে দ্বীন, জমহুর মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে কেরাম হাজার বছর থেকে চলে আসছে, সেই পথই আলোকিত ও উজ্জ্বল পথ। সেই পথ-ই সীরাতে মুস্তাকিম ও সরল পথ। সে পথের উপরেই মুসলমানের নীতি-আদর্শ ও কর্মপন্থা সুস্থির রাখা জরুরী।

- ইরশাদ হচ্ছে-

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورة الانعام: الآية: ১০৩)

“নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।” (সূরা আনআম: ১৫৩)

অতএব এতাতী সাদ গ্রুপের পথপন্থ, আদর্শ ও আমল ভ্রান্ত ও শরীয়ত বিরোধী। নিম্নে তাদের দর্শন ও কর্মকাণ্ডের সামান্য সূচী প্রদত্ত হলো-

এতাতীদের দর্শন ও আচার-আচরণ:

বর্তমানে সারা বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে মাওলানা সা'দ সাহেবের এতাতাদের উপর অঙ্গীকার করে, তার উপর অন্ধভাবে আস্থা রেখে এতাতী নামে যারা দাওয়াতের কাজ করছেন তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ভয়ঙ্কর আচার-আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে-

- ১। দ্বীনের বোধ, দ্বীনের ব্যথা-বেদনা ও অনুভূতি শুধুমাত্র মাওলানা সা'দ সাহেবের অনুকরণে প্রচলিত দাওয়াতী মেহনতের মধ্যে সীমিত। দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্ব তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে এতাতীরা ইসলামের একটি বিশেষ ফেরকার আকার ধারণ করে চলেছে। যেমনটি দেওবন্দের ফতোয়ায় আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- ২। এতাতীদের শ্লোগান হচ্ছে- মাওলানা সা'দ সাহেব সাহাবায়ে কেরামের সীরাতে থেকে যা কিছু উপলব্ধি ও উদ্ভাবন করবেন তার সঙ্গে জমহুর উলামায়ে কেরামের দ্বিমত থাকলেও মানতে হবে সা'দ সাহেবকে। এতে করে হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. থেকে পরবর্তী সকল বুজুর্গানে দ্বীন ও আকাবিরে দেওবন্দ কর্তৃক সীরাতে কোনো ব্যাখ্যা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৩। এতাতীদের মধ্যে এমন মানসিকতাও আশঙ্কাজনক হারে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে অন্য কোনো আলেমে দ্বীন তাদের আস্থাযোগ্য নয়। তাই দ্বীনের কোনো জিজ্ঞাসার জন্য কোনো আলেমের শরণাপন্ন হওয়া যাবে না। তাদের দৃষ্টিতে দ্বীনের ব্যাপারে শুধু দু'টি পথ খোলা আছে-
ক. সা'দ সাহেব নিজেই ইজতিহাদ করে দ্বীন চালিয়ে যাবেন।
খ. তারা তাদের দাওয়াতী মেহনতের সংশ্লিষ্ট কোনো আলেমের দ্বারস্থ হয়ে দ্বীনের কথা মেনে নিবে।
- ৪। এতাতীদের বর্তমান মানসিকতা এমনও পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, মাওলানা সা'দ সাহেবের সব কথা (বিতর্কিত হলেও) যারা মান্য করবে তারা হকপন্থী। আর তার সাথে যারা কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে দ্বিমত পোষণ করবে তারা উলামায়ে সূ।

৬। এতাতীরা যেহেতু মাওলানা সা'দ সাহেবকে নিষ্কলুষ আদর্শ, সেরা মুহাদ্দিস ও মুফাসসির, মুজতাহিদ ফকীহ, এমনকি মুজাদ্দিদের আসনে রাখতে শুরু করেছেন। এ কারণে তারা বলে থাকেন সা'দ সাহেব যা বলেন ও করেন এর সবই তার উপর ইলহাম হয়। এসব কারণে এতাতীরা মাওলানা সা'দ বিরোধীদের হকপন্থী মানতে নারাজ। তারা উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মাঠে ময়দানে এক প্রকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। মাওলানা সা'দ বিরোধীদেরকে গালিগালাজ, বিদ্রূপ, তিরস্কার করছে। তাদের ব্যাপারে কুমন্তব্য ও কুৎসা রটনা করে যাচ্ছে। যা ঈমান বিধ্বংসী আচার-আচরণ।

মাওলানা সা'দ সাহেবের অনুসারী এতাআতীরা উপরোক্ত কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারার কারণে সম্পূর্ণরূপে উলামা ও মাশায়েখ বিরোধী হিসাবে গণ্য হয়েছে। হক্কানী আলেম উলামার উপর তাদের সামান্যটুকু আস্থাও বিদায় নিয়েছে। তাই এতাআতীরা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একটি বাতিল ফিরকা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্যুত দল।

সুতরাং ধীনের তাবলীগ উলামায়ে উস্মতের তত্ত্বাবধানে করাই নিরাপদ। বিশেষকরে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলেমদের তত্ত্বাবধান ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য তাবলীগ করা কোনোভাবেই উচিত নয়। আলেমদের উপেক্ষা করে কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে তাবলীগ করা সম্পূর্ণ গোমরাহী। এতে অনুসরণকারী ও অনুকরণীয় ব্যক্তি উভয়জনই ভ্রষ্ট বলে বিবেচিত হবে। নিম্নে কিছু শরয়ী প্রমাণাদী প্রদত্তহলো-

الدين النصيحة أي بلغوا عني أحاديثي ولو كانت قليلة وقيل المراد من "الآية" الحكم الموحى إليه ﷺ وهو أعم من المتلوة وغيرها بحكم عموم الوحي الجلي والخفي قلت: الظاهر هو الأول (تحفة الاحوذى: ٤٢٦/١٤)

খোদ তাবলীগের মুক্কাব্বী ও প্রতিষ্ঠাতা হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ. উক্ত কাজে আওয়ামদের তত্ত্বাবধানের কারণে পুরো মেহনতের উপরে ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন।

مجھے دوسری فکر یہ لاحق ہے کہ اس جماعت میں عوام بہت کثرت سے آرہے ہیں اور اہل علم کی تعداد کم ہے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ جب عوام کے ہاتھ میں قیادت آتی ہے تو بعض اوقات آگے چل کر وہ اس کام کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ اسلئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جماعت کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے اور اسکا دبا ل میرے سر پر آجائے، اسلئے میرا دل چاہتا ہے کہ اہل علم کثرت سے اس جماعت میں داخل ہوں اور اس جماعت کی قیادت سمجھالیں۔ (درس ترمذی ۵/۲۱۳)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইলিয়াস রহ.ও আওয়ামদের তত্ত্বাবধানে তাবলীগ করা পছন্দ করতেন না এবং ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলেন।

Page 33 of 34

عن أبي هريرة ؓ قال قال رسول الله ﷺ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعته يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

অর্থাৎ ...যখন কোনো বিষয়ের দায়িত্বভার অযোগ্যের কাঁধে আসে তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা কর। (বুখারী শরীফ: হা.নং-৬৪৯৬)

৪। সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন-

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهلاً فاستلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.

অর্থাৎ রাসূল সা. বলেছেন, ...মানুষ যখন হক্কানী আলেমদের পাবে না তখন মুর্থদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। ফলে মুর্থরা জ্ঞান ছাড়াই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সমাধান দিবে। এতে তারা নিজেরাও ভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট করে ছাড়বে। (সহীহ বুখারী: হা. নং-১০০)

বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য মাও.সাদ সাহেবের কর্মকাণ্ড ও তার আকীদা বিশ্বাসের এতাতা ও অনুকরণ বর্জন করে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা মত জমহুর উম্মাহ/সংখ্যাগরিষ্ঠ উলমায়ে উম্মতের সাথে যুক্ত হয়ে তাবলীগ করা আবশ্যিক।

৫। ইমাম শাতেবী রহ. বলেন-

فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة، فليكن اعتقادك أن الحق في المسألة مع السواد الأعظم من المجتهدين، لا من المقلدين.

যখন কোন মতের প্রবক্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন তোমার এই বিশ্বাস থাকা উচিত, এই মাসআলায় মুজতাহিদের (গবেষক আলেম) বড় দলের সঙ্গেই হক আছে। অনুসারীদের সংখ্যা ধর্তব্য নয়। (আল মুওয়াফাকাত: ৪/১৭৩)

৬। ইমাম শাতেবী আরো বলেন- যে নতুন মাসআলা বিদ্বেষ, পরস্পরে বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করবে, আমরা বুঝে নেব সেটা দ্বীনের অংশ নয়। إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا (الانعام: ১০৭) এই আয়াতের তাফসীরে রাসূল সা. এমন মাসআলাকেই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক দ্বীনদার ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্যে তা পরিহার করা আবশ্যিক। (আল মুওয়াফাকাত: ৪/৫১১)

والله أعلم بالصواب

كتبه

محمد ميزان الرحمن سعيد

الرئيس والمؤسس بمركز الشيخ زكريا للبحوث الإسلامية دكا